অন্ধের মতো কিছু না বুঝিয়া, না শুনিয়া, ভেড়ার মতো পেছন ধরিয়া চলিও না। নিজের বুদ্ধি, নিজের কার্যশক্তিকে জাগাইয়া তোলে।

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

একাদশ ও দ্বাদশ সংস্করণ, মার্চ-এপ্রিল, ২০২৪ ■ ৫১তম বর্ষ ■ মূল্য ২ টাকা

যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস প্রতিপালিত

বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের দিন হল মে দিবস। ১৮৮৬ সালের এই দিনে মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের হে মার্কেটের শ্রমিকরা আট ঘণ্টা কাজের দাবিতে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওই দিন তাদের আত্মদানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকের আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হল শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের নিরলস পরিশ্রম। হাজার বছর ধরে শ্রমজীবী মানুষের রক্ত-মাংসে যে মানব সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে, তা থেকে সেই শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীই থেকেছে উপেক্ষিত। আজকের উন্নত-সমৃদ্ধ পৃথিবীর কারিগর এসব অবহেলিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত, অধিকার

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষের 'অধিকার' আদায়ে অব্যাহত রয়েছে নিরন্তর সংগ্রাম।

সময়ের পরিক্রমায় 'অধিকার' শব্দটির সুদৃঢ় শক্তি সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ও দর্শনকে প্রভাবিত করেছে এবং পরিবর্তন সাধিত করেছে। শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের প্রবণতা পৃথিবীর দেশে দেশে অধিকার বঞ্চিত মেহনতী মানুষের মধ্যে এক নবতর জাগরণের প্রস্ফুটন ঘটায়। শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলন সংগ্রামের পথ পরিক্রমায় গতিশীল হয়েছে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় গণতান্ত্রিক আদর্শের অগ্রযাত্রা। স্বাধীনতা, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চারিত হয়েছে বিশ্বের বিবেকবান নাগরিকদের মানবিক সত্ত্বায়। মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও মানবিক বিশ্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে শ্রমজীবী মানুষের আত্মনিবেদন।

মহান মে দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে নানা কর্মসূচী নেওয়া

রক্ত পতাকা উত্তোলন

হয়েছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শ্রমিক সমাবেশ, আলোচনা সভা, সেমিনার প্রভৃতি। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলিও যথাযথ মর্যাদার সাথে মে দিবস উদ্‌যাপন করেছে গোটা রাজ্যজুড়ে। কর্মচারী ভবনে দুপুর ৩টে থেকে মূল কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস রক্তপতাকা উত্তোলন করেন। তারপর সভার কাজ শুরু হয়। সভা পরিচালনা করেন মানস দাস। সভায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, তীব্র দাবদাহের মধ্যে আজ যারা উপস্থিত হয়েছেন তাদের সকলকেই অভিনন্দন জানাই। একটা নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভারত সহ গোটা বিশ্বে বিরাজ করছে। আজ থেকে ১৩৮ বছর আগে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা আজও চলছে। আট ঘণ্টা কাজ, আট ঘণ্টা বিনোদন ও আট ঘণ্টা বিশ্রাম এই দাবিকে সামনে রেখে যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা আজ আর ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে সীমাবদ্ধ নেই। আজকের লড়াই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে শ্রমজীবী মানুষ শোষিত হচ্ছেন, বঞ্চিত হচ্ছেন, আক্রান্ত হচ্ছেন সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষ বহু লড়াই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে যে যে অধিকারগুলো অর্জন করেছিল তার উপর ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ সংগঠিত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ প্রতিবাদ

প্রবীর মুখার্জী

সংগঠিত করছেন। দিকে দিকে ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন গড়ে উঠছে। এই ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে নানা ছলাকলার মাধ্যমে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। ভারতবর্ষে স্বাধীনতার পরে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল তার মুখ্য অভিমুখ ছিল মানুষের কাজ পাওয়ার অধিকার। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে যে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প গঠন করা হয়েছিল তাতে পুরোপুরি না হলেও প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল।

শহীদ মিনার অভিমুখে মিছিল

জনকল্যাণের স্বার্থে কিছু সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা অগ্রাধিকার পাচ্ছিল। কিন্তু ২০১৪ সালের পর

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

দু'দফার নির্বাচনের পর সুর বদল শাসকদলের

দেশজুড়ে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে ১৯ এপ্রিল, চলবে ১ জুন পর্যন্ত ৭ দফায়। ইতিমধ্যে দু'দফায় ১৯০টি আসনে নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম দফায় ১৯ এপ্রিল ১৭টি রাজ্য ও ৪টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ১০২টি আসনে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ (২), অসম (৫), বিহার (৪), ছত্তিশগড় (১), মধ্যপ্রদেশ (৬), মহারাষ্ট্র (৫), মণিপুর (২), মেঘালয় (২), মিজোরাম (১), নাগাল্যান্ড (১), সিকিম (১), রাজস্থান (১২), তামিলনাড়ু (৩৯), ত্রিপুরা (১), উত্তরপ্রদেশ (৮), উত্তরাখন্ড (৫), পশ্চিমবঙ্গ (৩), লাক্ষাদ্বীপ (১), আন্দামান নিকোবর (১), পুঁদুচেরি (১), জম্মু ও কাশ্মীর (১)টি আসনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। একইভাবে ২৬ এপ্রিল ১৩টি রাজ্যের ৮৯টি আসনে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও মধ্যপ্রদেশের বেতুল কেন্দ্রের বিএসপি প্রার্থী মারা যাওয়ায় ৮৮টি আসনে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে কেরল (২০), কর্ণাটক (১৪), মহারাষ্ট্র (৮), রাজস্থান (১৩), উত্তরপ্রদেশ (৮), মধ্যপ্রদেশ (৬), পশ্চিমবঙ্গ (৩), বিহার (৫), আসাম (৫), ছত্তিশগড় (৩), মণিপুর (১), ত্রিপুরা (১), জম্মু ও কাশ্মীর (১)। পরবর্তী আরও ৫ দফায় বাকি আসনগুলিতে নির্বাচনের পর আগামী ৪ জুন ২০২৪ ভোটগণনার পরবর্তীতে জানা যাবে আগামী ৫ বছরের জন্য দেশের শাসনভার বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র হাতেই থাকবে, না কংগ্রেস-বামপন্থী সহ বিরোধী দলসমূহের 'ইন্ডিয়া মঞ্চ' আগামী সরকার গঠন করবে।

১৯ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট গ্রহণের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি সেদিন রাতেই জোরালোভাবে জানান, ভোটাররা বিপুলভাবে সমর্থন জানিয়েছেন এনডিএকেই। তার ভাষায় 'যা জানতে পেরেছি, তাতে অভিভূত, রেকর্ড পরিমাণ মানুষ তাদের রায় দিয়েছেন এনডিএ-র পক্ষেই।' একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে অমিত শাহের গলায় জয়পুরে নির্বাচনী সভায়। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের অভিমত '৪০০ পারের' গতি ধরে রাখার স্বার্থেই মোদি এবং শাহ ঐসব 'এনডিএ'র পক্ষে রেকর্ড ভোট-এর গল্প শুনিয়েছেন। কিন্তু প্রথম দফায় এনডিএ-র মূল টার্গেট তামিলনাড়ুতে মোদি শাহের বিশ্বস্ত সেনাপতি হিসাবে লড়াই করা দলের রাজ্য সভাপতি কে. আন্নামালাই কোয়েম্বাটোরে ফের ভোট গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। কারণ হিসাবে তিনি জানিয়েছেন তার কেন্দ্রের ১ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম নেই। অথচ এই আন্নামালাইয়ের ওপর ভর করেই তামিলনাড়ুতে কয়েকটি আসন জিতবে বলে বিজেপি জোর আওয়াজ তুলেছিল। সেই আন্নামালাই এখন হারবেন বুঝেই নিজের কেন্দ্রে আবার ভোটের দাবি জানাচ্ছেন! একারণেই ডিএমকে-কংগ্রেস-বামপন্থীদের জোট রাজ্যের ৩৯টি আসন জিতবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন ডিএমকে নেত্রী কানিমোঝি। আবার এই লোকসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোট ভালো ফল করবে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস নেতা সচিন পাইলট। প্রথম দফার পরে তিনি বলেন, লোকসভা নির্বাচনে এবার 'জাদু সংখ্যা' ২৭২ আসন পার করবে ইন্ডিয়া। তিনি আরও বলেন রাজস্থানে বিজেপির থেকে বেশি আসনে জিতবে কংগ্রেস। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের ৮ আসনের ভোটের পর সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ সিং যাদব জানিয়েছেন প্রথম দফা ফ্লপ হয়ে গেল বিজেপির। দেশের সচেতন জনগণ দেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলে প্রথম দফায় ভোট দিয়েছেন। ইন্ডিয়া মঞ্চের প্রার্থীদের তারা বিপুলভাবে সমর্থন জানিয়েছেন। এজন্য তাদের অভিনন্দন। একইভাবে আরজেডি নেত্রী মিশা ভারতী দাবি করেছেন দেশে 'ইন্ডিয়া'

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

হাতে হাতে
হাতিয়ার,
নতুন বর্ষে
সংগ্রামী
হাতিয়ারের গ্রাহক
বৃদ্ধি করুন,
সকল কর্মচারী
বন্ধুর হাতে তুলে
দিন শক্তিশালী
হাতিয়ার,
গড়ে তুলুন
চিন্তা-চেতনার
ঐক্য।

সম্পাদকীয়

এক দেশ এক ভোট—কেন?

মোদি সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদাগুলির প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে, এরকম কিছু বিষয়কে সামনে নিয়ে আসছে যেগুলি এই মুহূর্তে আশু করণীয় নয়। শুধু তাই নয়, এমন কিছু বিষয় তারা কার্যকরী করতে চাইছে, যেগুলি ভারতের সংবিধান, ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মান্যতা দেয় না। সেরকমই একটি বিষয় হল 'এক দেশ এক ভোট'।

মোদি সরকারের এই 'এক দেশ এক ভোট' প্রকল্পটির তাৎপর্য সুদূরপ্রসারী। 'এক দেশ এক ভোট' মানে সবক'টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন এবং দেশের লোকসভা নির্বাচন একসাথে করতে হবে। এর জন্য দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোভিন্দের নেতৃত্বে আট সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই কমিটি সবক'টি রাজনৈতিক দলের কাছে এই প্রসঙ্গে তাদের মতামত জানতে চায়। কিন্তু এই উচ্চপর্যায়ের কমিটির কার্য বিবরণীতে যা বলা আছে তাতে বোঝা যায় যে রাজনৈতিক দলগুলির সাথে আলোচনা আসলে লোক দেখানো। কার্যবিবরণী পাঠ করলে বোঝা যায় যে 'এক দেশ এক ভোট' নীতি চালু করার সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কমিটির দায়িত্ব এই নীতি কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় আইনী ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো কিরকম হবে তার প্রস্তাব তৈরি করা। এটা বলে রাখা দরকার যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের এই উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করেছে। ২০১৮ সালে জাতীয় আইন কমিশনও এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত চেয়েছিল।

'এক দেশ এক ভোট' বিষয়টি আমাদের সংবিধানের মর্মবস্তুর বিরোধী। ভারতের সংবিধানে দেশের জনগণের মতামত বা ইচ্ছাকেই কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হয়েছে। এর জন্যই সংবিধানের প্রস্তাবনায় খুব সুন্দরভাবে শুরুতে এবং শেষে বলা আছে 'আমরা ভারতের জনগণ" এবং 'এতদ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।" ভারতের জনগণ তাদের সার্বভৌমত্ব অনুশীলন করে তাদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে। এই জনপ্রতিনিধিরা জনগণ, আইনসভা এবং সরকারের প্রতি দায়বদ্ধ। আমাদের সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ ধারা কোনোভাবে বিঘ্নিত হওয়া উচিৎ নয়।

লোকসভা এবং বিধানসভাগুলির ভোট একসাথে করলে রাজ্যের নির্বাচিত সরকারগুলির বিধানসভার প্রতি সংবিধান বর্ণিত যে দায়বদ্ধতা আছে তাকে অহেতুক বিঘ্নিত করা হবে। সংবিধানের ৭৫(৩) ধারায় বলা আছে যে মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। একইভাবে সংবিধানের ১৬৪(১) ধারায় বলা আছে মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে রাজ্য বিধানসভার প্রতি দায়বদ্ধ থাকবে। সংবিধান অনুযায়ী যদি কোনো সরকার আস্থা ভোটে পরাজিত হয় অথবা অর্থ বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে সেই সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য থাকবে। যদি কোনো বিকল্প সরকার গঠন করা না যায় তবে আইনসভা ভেঙে গিয়ে মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে। সংবিধানের ৮৩(২) এবং ১৭২(১) ধারা অনুযায়ী লোকসভা এবং বিধানসভা পাঁচ বছরের জন্য হবে, যদি না তার আগে সরকার পড়ে যায়। অর্থাৎ কোনো নিম্নসীমা বলা নেই, কিন্তু উর্ধ্বসীমা বলা আছে।

সুতরাং লোকসভা বা বিধানসভার মেয়াদ বৃদ্ধি করার যে কোনো উদ্যোগ শুধু অসাংবিধানিক নয়, অগণতান্ত্রিক হবে। এর দ্বারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করার মধ্য দিয়ে জনগণের ইচ্ছাশক্তির বহিঃপ্রকাশের প্রক্রিয়া লঙ্ঘিত হবে।

'এক দেশ এক ভোট' নীতি কার্যকর করার জন্য সংবিধান পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। নীতি আয়োগের এরকমই একটা প্রস্তাবে বলা হয়েছে, যদি লোকসভা ভেঙে দিতেই হয় এবং লোকসভার মেয়াদ কম, অবশিষ্ট থাকে তাহলে বাকি সময়কাল দেশ চালাবেন রাষ্ট্রপতি। তারই নিয়োজিত মন্ত্রিপরিষদের যুক্তি পরামর্শ নিয়ে। এটা চলবে যতদিন না পরবর্তী লোকসভা গঠিত হচ্ছে। এই প্রস্তাব আসলে পেছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসনজারির প্রয়াস, বিজেপি-আর এস এস যেটা চায়। রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এরকম হলে প্রস্তাব করা হয়েছে যে বাকি মেয়াদ রাজ্যপাল চালাবেন। এটাও বকলমে কেন্দ্রীয় শাসন।

আরেকটি প্রস্তাব হল যদি লোকসভা ভাঙার সময় বাকি মেয়াদকাল দীর্ঘ থাকে তবে বাকি মেয়াদকাল পূর্ণ করার জন্য নতুন করে নির্বাচন করতে হবে। ধরা যাক যদি কোনো লোকসভা দুই বছর পর ভেঙে যায়। তাহলে পরবর্তী তিন বছর চালানোর জন্য আবার নির্বাচন করতে হবে। জনগণকে প্রভাবিত করার জন্য বিজেপির বক্তব্য হল 'এক দেশ এক ভোট' হলে নির্বাচনী ব্যয় কমবে। ওদের এই প্রচার উপরোক্ত প্রস্তাবে নস্যাৎ হয়।

জাতীয় আইন কমিশনের প্রস্তাব হল যখনই কোনো অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে, তার সাথে পরবর্তী বিকল্প নেতার প্রস্তাবের উপরও ভোটাভুটি হবে। এর মধ্য দিয়ে আইন সভার সদস্যদের একটা সরকারকে সরিয়ে দেবার অধিকারকে, নতুন সরকার গঠনের সাথে শর্তযুক্ত করা হচ্ছে, যা সংবিধান মান্যতা দেয় না।

একসাথে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন চালু হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। সংসদীয় স্টিয়ারিং কমিটির ২০১৫-তে ৭৯তম রিপোর্ট এবং নীতি আয়োগের সুপারিশ বলছে যে একসাথে উভয় নির্বাচন করতে গেলে কিছু বিধানসভার মেয়াদ বৃদ্ধি এবং কিছু বিধানসভার মেয়াদ হ্রাস করা হোক। বিধানসভার মেয়াদ বৃদ্ধি বা হ্রাস উভয়ই রাজ্যের অধিকারের উপর আক্রমণ। একই সাথে তা দেশের নাগরিকদের বিধায়ক নির্বাচিত করার অধিকারের উপরও আক্রমণ। এটা ভুলে গেলে চলবে না রাজ্যগুলির বিধানসভা নির্বাচনের সময় লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকে আলাদা হওয়ার প্রথম কারণ হল, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংবিধানের ৩৫৬ ধারার অপপ্রয়োগ। এর প্রথম শিকার হয়েছিল ১৯৫৯ সালে কেরালার কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা।

'এক দেশ এক ভোট' নীতি মোদি সরকারের দ্বারা সংবিধানস্বীকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর গুরুতর আক্রমণ। বিজেপির কেউ কেউ আবার লোকসভা, বিধানসভার সাথে স্থানীয় নির্বাচনগুলিকেও একসাথে করার কথা বলছে। বিজেপি, আর এস এস-এর লক্ষ্য ভারতের সংবিধানকে আক্রমণ। ওরা যুক্তি দিচ্ছে এক সাথে ভোট হলে অনেক ব্যয় সঙ্কোচন হবে, বার বার নির্বাচন হলে আদর্শ আচরণবিধির প্রয়োগের ফলে উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয় ইত্যাদি। বিজেপি ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদি 'এক দেশ এক ভোট'-এর কথা বলে যাচ্ছে। ২০২০ সালে মোদি বলেছিলেন যে এটা কোনো বিতর্কের বিষয় নয় বরং দেশের আশু প্রয়োজনীয় বিষয়। ইতিমধ্যে এটাকে কেন্দ্র করে তিনটি কমিটিতে আলোচনা হয়েছে। ২০১৫ সালে সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, ২০১৭-তে নীতি আয়োগ এবং আগস্ট ২০১৮-তে আইন কমিশন—এই তিনটি কমিটিই তাদের সুপারিশ পেশ করে।

ভারতে ২৮টি রাজ্য আছে, যারা রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে প্রভূত বৈচিত্র্যময়। এদের মধ্যে অগণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচনী অভিন্নতা নিয়ে আসার উদ্যোগ আর এস এস-বিজেপির মস্তিষ্কপ্রসূত। আসলে 'এক দেশ এক ভোট'-এর ধারণা আর আর এস এস-বিজেপির 'এক জাতি, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি' এই শ্লোগানের মধ্যে কোনো ভিন্নতা নেই। আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে 'এক দেশ এক ভোট' নীতির মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করে ক্ষমতার আরও কেন্দ্রীকরণ ঘটাতে চায় আর এস এস-বিজেপি। ওদের এক নেতা বলেছে 'এক দেশ, এক নেতা' দেশ মেনে নিয়েছে। এখন সেই নেতা অর্থাৎ মোদির ইচ্ছা 'এক দেশ এক ভোট' কার্যকরী করতে হবে।

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের নির্বাচকমণ্ডলী দেশের সংবিধান, সংসদীয় গণতন্ত্র বাঁচানোর রাজনৈতিক সংগ্রামে এই মুহূর্তে লিপ্ত রয়েছেন। তাঁরা ভালোই জানেন মোদি সরকারের 'এক দেশ এক ভোট'-এর আড়ালে আদপে রয়েছে 'এক দেশ, এক একনায়কত্ব'। □

১২ মে, ২০২৪

সমিতি সম্মেলন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির ২১তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বিগত ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ কমরেড সমীর ভট্টাচার্য নগর (বারুইপুর), কমরেড সুনীলবরণ চক্রবর্তী-অমিয় চক্রবর্তী মঞ্চ, কমরেড রামেশ্বর ব্যানার্জী, কমরেড প্রশান্ত সাহা সভাকক্ষ রবীন্দ্র ভবনে, বারুইপুর দক্ষিণ ২৪ পরগনা। সম্মেলনের প্রাক্কালে ২৩ ফেব্রুয়ারী লাল পতাকায় সুসজ্জিত এক দৃপ্ত মিছিল হয়। কুলপি রোড ধরে এলাকা পরিক্রমা করে রেলগেট পেরিয়ে সুবিশাল মিছিল পৌঁছোয় বারুইপুর রবীন্দ্রভবনে সম্মেলন স্থলে। এদিন মিছিল শেষে সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সলিল চৌধুরীর নামাঙ্কিত পুস্তক বিপণি কেন্দ্রর উদ্বোধন হয়। বুক স্টলের উদ্বোধন করেন কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা এবং প্রাক্তন সহ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রবীর মুখার্জী। পরবর্তীতে পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তার বিষয় নিয়ে সম্মেলন মঞ্চে একটি সংক্ষিপ্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির রাজ্য সভাপতি শমীক সেনগুপ্ত। মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। ১,০৩, ৯০২ টাকার বই উপস্থিত প্রতিনিধিরা ক্রয় করেন।

২৪ ফেব্রুয়ারী রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে রাজ্য সম্মেলনের প্রারম্ভিক সূচনা হয়। রক্তপতাকা উত্তোলন করেন সমিতির সভাপতি শমীক সেনগুপ্ত। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতি শমিক সেনগুপ্ত, অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদক রজত সাহা, মহতী ২১তম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক সুমিত ভট্টাচার্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও প্রাক্তন সম্পাদক সংগ্রামী হাতিয়ার এবং ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক। এছাড়াও বিভিন্ন ভ্রাতৃপ্রতীম সংগঠনের উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সম্মেলনের অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক গোপাল চ্যাটার্জী মাল্যদান করেন।

সম্মেলন পরিচালনা করেন শমীক সেনগুপ্ত, অলকেন্দু চ্যাটার্জী, রত্না গাজী ও সুধাংশু দেবকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। ২১ম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর উদ্বোধনী বক্তব্য পেশ করেন। একই সঙ্গে ২১টি লাল বাতি জ্বালিয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উদ্বোধনী সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী কমিটির সভাপতি রজত সাহা ও জেলা ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক অশোক সাহা। উল্লেখ্য, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি মালিনী ভট্টাচার্য অসুস্থ থাকার দরুণ তাঁর Voice Massage এবং সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে তাঁর স্বাগত ভাষণের লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন কার্যকরী কমিটির সভাপতি রজত সাহা। উদ্বোধনী সমাবেশের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশিত হয়।

প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক অরুণা ঘোষ। আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন প্রিয়ব্রত সেন। সমিতির সাধারণ দাবিদাওয়া সংক্রান্ত প্রস্তাব, নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারী সুরক্ষার দাবি, সর্বনাশা বিদ্যুৎ বিল ও স্মার্ট মিটার বসানোর বিরুদ্ধে, বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে, বিশ্ব উষ্ণায়নের মাত্রা হ্রাস করা ও পরিবেশ রক্ষা করা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, মূল্যবৃদ্ধি রোধে সারা দেশে কার্যকরী গণবণ্টন অবিলম্বে চালুর দাবি সহ ১২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। একই সঙ্গে ২১তম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে প্রকাশিত সমিতির মুখপত্র 'প্রবীণ কণ্ঠ' পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অধ্যাপক পার্থপ্রতীম বিশ্বাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও সম্মেলনকে কেন্দ্র করে এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভা হয়। বিষয় ঃ 'বর্তমান ভারতে মধ্যবিত্তের অস্তিত্ব, চাহিদা ও সঙ্কট'। সঞ্চালক ভানুদেব চক্রবর্তী এবং আলোচক অধ্যাপক পার্থপ্রতীম বিশ্বাস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ৫৯ জন মহিলা সহ মোট ৪৮৩ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২২টি জেলার পক্ষ থেকে ৩৬ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও খসড়া প্রস্তাবাবলীকে সমৃদ্ধ করে আলোচনা করেন। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি, ভ্রাতৃপ্রতীম প্রতিনিধি ও অতিথিদের সামনে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি রজত সাহা ও অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক গোপাল চ্যাটার্জী। সম্মেলনে পরিচিতি বিষয়ক তথ্য পেশ করেন উজ্জ্বল দত্তগুপ্ত। সম্মেলনে সবচেয়ে বেশিবার উপস্থিত ছিলেন ১৯টি সম্মেলনে, সুনীতি ব্যানার্জী, হুগলী। উপস্থিত সম্মেলনে প্রতিনিধিদের সামনে সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুপ্রিয় রায় চৌধুরী।

সম্মেলন থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতির ১৬০ জনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ১৩ জন স্থায়ী আমন্ত্রিত সহ মোট ৩১ জনের নতুন সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হয়েছে। নতুন কমিটির সভাপতি পদে খগেন চক্রবর্তী, সাধারণ সম্পাদক পদে অরুণা ঘোষ, যুগ্ম সম্পাদক কাঞ্চন মুখার্জী ও সুজিত দাশগুপ্ত, দপ্তর সম্পাদক অশেষ সান্যাল ও কোষাধ্যক্ষ গৌতম দাস সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হয়েছেন। পত্রিকা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন রবি কুশারী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। □

আক্রান্ত সংবিধান ও দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বৃহত্তর পরিসর গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে গত ১৬ মার্চ, ২০২৪ শনিবার শেষ হল **রাইটার্স বিল্ডিংস গ্রুপ ডি কর্মচারী ও রেকর্ড সাপ্লায়ার্স এ্যাসোসিয়েশন**-এর (দ্বি-বার্ষিক) সম্মেলন। একদিনের এই সম্মেলন কমরেড পরিতোষ দাস এবং কমরেড আলো রায় নগর ও কমরেড মালতী চ্যাটার্জী এবং অনিন্দ্য সুন্দর পুরকাইত মঞ্চ, কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হল শিয়ালদহ কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সৌমেন দত্ত। স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি দেবশঙ্কর সিনহা।

সম্মেলনে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক তরুন চক্রবর্তী, আয় ও ব্যয়ের তথ্য পেশ করেন সোমনাথ নিশাদ এবং খসড়া প্রস্তাবাবলী পেশ করেন শ্যামল সাহা। সমর্থন করেন অর্চনা সাহা। ২৫ জন মহিলা সহ মোট ৮৫ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ১ জন মহিলা সহ ৬ জন প্রতিনিধি সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জবাবী ভাসণ দেন যুগ্ম সম্পাদক অপরেশ মজুমদার। সম্মেলন থেকে ৪৬ জনের নতুন কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। সম্মেলন থেকে সভাপতি মলয় সান্যাল, শ্যামল চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সোমনাথ নিশাদ এবং দপ্তর সম্পাদক গৌরাঙ্গ সরকার নির্বাচিত হন।

সম্মেলনের কাজ পরিচালনা করেন অভিজিৎ বোস এবং সোমনাথ ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

সুকান্ত চৌধুরী

সংবাদ পরিক্রমা সংবাদ পরিক্রমা সংবাদ পরিক্রমা

মদ বিক্রি করে কোষাগারের আয় বৃদ্ধিতে দেশের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে পশ্চিমবঙ্গ। এরাজ্যের ঠিক আগে রয়েছে উত্তর প্রদেশ। মদ বিক্রি থেকে রাজ্যের কোষাগারের আয় নিয়ে রিজার্ভ ব্যাংকের তরফ থেকে একটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছে। এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে এরাজ্যের নিজস্ব আয়ের ২০.২৩ শতাংশই এসেছে মদ বিক্রি থেকে। উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্রে এই হার ২২.০৮ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে থাকা কর্নাটকের ক্ষেত্রে এই হার ২০ শতাংশ। সেখানে মহারাষ্ট্রের মতো শিল্পোন্নত রাজ্যের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ৮.৪৫ শতাংশ। এরাজ্যে ১০০ দিনের কাজ বন্ধ। রাজ্যে কাজ না পেয়ে ভিনরাজ্যে চলে যাওয়া পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৪০ লক্ষের অধিক। স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ করতে পারেনা রাজ্যের বর্তমান সরকার। সেখানে রাজ্যের নিজস্ব আয়ের ২০ শতাংশের বেশি আসে মদ বিক্রি থেকে। গত ২০২৩ সালের বাজেটেই রাজ্যে মদ বিক্রি থেকে আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির প্রস্তাব ছিলো। ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৩ বছরে বর্তমান সরকার দুটি কাজ করে গেছে। বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়া এবং মদ বিক্রির থেকে রাজ্যের আয়ের সংস্থান বাড়ানো। এই লক্ষ্যে হুহু করে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে মদের দোকানের। □

সংবিধান বহির্ভূত পদের ভারে বিধ্বস্ত রাজ্য প্রশাসন। রাজ্যে স্থায়ী শূন্য পদগুলোতে স্থায়ী নিয়োগ না হলেও একের পর এক নতুন নতুন পদের বিপুল আর্থিক ভার বহন করতে হচ্ছে রাজ্যের জনগণকে। বয়স এবং শারীরিক কারণে নির্বাচনে না দাঁড়ালেও গত তিনবছর ধরে রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমান পদমর্যাদা নিয়ে আর্থিক উপদেষ্টার পদ সামলে যাচ্ছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র। একই সঙ্গে মুখ্যসচিব পদ থেকে অবসর নেবার পর থেকে প্রাক্তন মুখ্যসচিবও সামলাচ্ছেন আর্থিক উপদেষ্টার দায়িত্ব। একজন প্রশাসনিক শীর্ষকর্তার সমান সুযোগসুবিধার বিপুল দায়ভার বহন করতে হচ্ছে রাজ্যের জনগণকে। অপর এক প্রাক্তন মুখ্যসচিব আবার সামলাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টার দায়িত্ব। একইভাবে শাসকদলের ঘনিষ্ঠ পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারাও অবসরের পর নতুন নতুন সৃষ্টি হওয়া পদে আসিন।। এইসব পদগুলোর অধিকাংশেরই কোনো সাংবিধানিক বৈধতা নেই। অনেকক্ষেত্রে এই পদগুলোর কারণে প্রশাসনের অভ্যন্তরে যারা সংবিধান স্বীকৃত পদের আধিকারিক, তাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একের পর এক আইএএস, আইপিএস আধিকারিক অবসর নিচ্ছেন। বিপুল টাকা খরচ করে তাদের পদে রেখে সরকারের কোষাগারের কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে। শুধু তাই নয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বহু শূন্যপদ ফেলে রেখে অবসরের পর পুনর্নিয়োগের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে দপ্তর। □

গাজায় নিহতের তালিকা ২৫ হাজার অতিক্রম করেও গণহত্যা অব্যাহত। রক্তাক্ত ভূখণ্ডে ইজরায়েলের আগ্রাসন থামার কোনো লক্ষ্মণ নেই। প্যালেস্টাইন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে দেওয়া বিবৃতিতে গাজা ভূখণ্ডের এই পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। তবে হাজার হাজার মানুষের মৃতুর পরেও নিজেদের অভিষ্ট অর্জনে ব্যর্থ ইজরায়েল। হামাসকে নির্মূল করা বা বন্দীদের উদ্ধার করা, কোনো লক্ষ্যেই জায়নবাদীরা সফল হননি। অতীতে এমন মৃতু, ধ্বংস অথবা গৃহহীন হবার আবহে প্যালেস্টাইনের মানুষকে পড়তে হয়নি। ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ) -এর আধিকারিকরা আরও কয়েকমাস এই সেনা অভিযান চলবে বলে ঘোষণা করেছেন। অপরদিকে গাজায় হামাসের হাতে বন্দী মানুষদের অবস্থা ইজরায়েলের অতি দক্ষিণপন্থী সরকার এবং আম জনতার মধ্যে ফাটল তৈরী করছে। হামাসের আক্রমণে সম্প্রতি আইডিএফের ২১ জন সেনার মৃত্যু ঘটে। □

শ্রমিক ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে উঠলো আর্জেন্টিনা। বুয়েনস এয়ার্সের রাস্তায় হাজার শ্রমিকের মিছিল চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে দেশের দক্ষিণপন্থী সরকারের সামনে। বারোঘন্টার ধর্মঘটে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় গোটা দেশ। গণপরিবহন থেকে ব্যাংক, ধর্মঘটে শামিল সব প্রতিষ্ঠান। দেশবাসীর বিপুল অংশ সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়েছে এই ধর্মঘটের প্রতি। দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলোকে নিয়ে তৈরী সবচেয়ে বড়ো মঞ্চ "জেনারেল কনফেডারেশন অফ লেবার" এই ধর্মঘটের ডাক দেয়। অতি দক্ষিণপন্থী সরকার ক্ষমতায় আসার পর আর্জেন্টিনার মুদ্রাস্ফীতির হার ২১১%। দেশ ঋণের ভারে ন্যুব্জ। এর থেকে বেড়িয়ে আসতে বেসরকারিকরণের পথ বেছে নেয় সরকার। রাষ্ট্রপতির এই বেসরকারীকরণের উদ্যোগের বিরোধিতা করতেই সোচ্চার হয় দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি। তারা বলেছেন যে দেশের অর্থনীতি বদলানোর নামে প্রথমেই আঘাত নামিয়ে আনা হয়েছে শ্রমিকদের উপর। □

লোকগানে সিউড়ির রতন কাহার এবং পরিবেশবন্ধু বাঘমুন্ডীর দুখু মাঝি এবছরের পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন। বিড়ি বাঁধাই থেকে লোকগানে উত্তরণ শ্রী রতন কাহারের। একের পর এক অনবদ্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে তাঁকে চিনেছে দুনিয়া। চরম দারিদ্রের সাথে লড়াই করে লোকগান চর্চায় আজও ব্রতী শ্রী কাহার। রুজিরুটির চাহিদাকে উপেক্ষা করেই নিজেকে সঁপে দিয়েছেন লোকসংগীত সাধনায়। আজ বয়স নব্বইয়ের দোরগোড়ায়। তবু তাঁর লোকসংগীত চর্চার ক্ষেত্রে কোনো ছেদ পড়েনি।

পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডী থানার সিন্দ্রি গ্রামের বাসিন্দা দুখু মাঝি। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি আত্মোপলব্ধি করেছিলেন যে গাছ মানুষের জীবনে কতটা উপকারী। সে থেকেই তিনি মাঠঘাট সর্বত্র গাছ লাগাতে শুরু করেন। যেখানেই ফাঁকা জায়গা দেখতেন, চারাগাছ পুঁতে তার পরিচর্যা করতেন। তিনি প্রথাগত লেখাপড়া না জানলেও গাছের উপকারিতা বোঝেন, তিনি বোঝেন অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা বেঁচে থাকার জন্য। তাই গাছ লাগিয়ে তিনি মানুষের জন্য অক্সিজেনের জোগান দেন। □

বিকল্প উঠে এলো কেরালার বাজেটে। পশ্চিমবঙ্গের মতো রাজ্য যেখানে মুখে মেকি বিরোধিতা করলেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দেখানো পথেই হাঁটছে, সেখানে উল্টো পথে হেঁটে কেরালার বাম গণতান্ত্রিক সরকার বাজেটে জোর দিয়েছে কর্মসংস্থানে। নেওয়া হলো রাজ্যের উন্নয়নে একগুচ্ছ সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প। কেরালার এবারের বাজেটে পরিষ্কার যে রাজ্যের বামপন্থী সরকার সমাজের প্রান্তিক মানুষের উপকারের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। বাজেটে জোর দেওয়া হয়েছে বয়স্কদের জন্য সরকারি পেনসন, গণবন্টন ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক সাহায্যমূলক কর্মকাণ্ডকে শক্তিশালী করার জন্য। এবারের বাজেটে কর্মসংস্থানে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বিগত বছরের বাজেটের সময় শুরু বিভিন্ন নতুন প্রকল্পে আরও পঞ্চাশ হাজারের বেশী কাজের সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং তথ্য-প্রযুক্তি ক্ষেত্রেও। □

ক্রমশ সর্বগ্রাসীতার দিকে এগোচ্ছে দেশ, এমনই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ। সম্প্রতি দিল্লিতে নাগরিক সমাজ, মানবাধিকার কর্মী, প্রাক্তন সরকারি আধিকারিক, সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদদের এক কনভেনশন থেকে এই আশংকা জানানো হয়েছে। এই "ডেমোক্রেসি কনভেনশন" থেকে দেশের মানুষের বিবিধ ক্ষেত্রের অধিকার রক্ষা এবং আদায়ের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। তরুণ প্রজন্ম এবং মহিলাদের কর্মসংস্থান, সাম্প্রদায়িকতার ঢেউ আটকানো, সাংবিধানিক অধিকার এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলোর স্বায়ত্তশাসন রক্ষা, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো শক্তিশালী করা, সমতা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করাসহ বিভিন্ন জ্বলন্ত বিষয়ে আলোচনা এবং প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় কনভেনশনে। দুদিনের কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সিপিআই (এম) সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, জম্মু-কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা, কংগ্রেস নেতা সলমন খুরশিদ, সিপিআই(এম) নেতা ইউসুফ তারিগামীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। কনভেনশন থেকে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য বিলের প্রয়োগ নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বক্তারা। ইউএপিএ এবং জম্মু-কাশ্মীর এর পিএসএ-এর মতো দানবীয় আইন বাতিলেরও দাবী তোলা হয়েছে কনভেনশন থেকে। আরটিআই আইনকে আরও শক্তিশালী করার সুপারিশ করা হয়েছে কনভেনশন থেকে। একইসাথে 'একদেশ এক নির্বাচন" নিয়ে গঠিত কমিটিও বাতিল করার দাবি জানানো হয়েছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বক্তারা। □

১৬ই ফেব্রুয়ারী সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার ডাকা গ্রামীণ ভারত বন্ধ এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকা ক্ষেত্রভিত্তিক শিল্প ধর্মঘটে শামিল হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠলো সারা ভারত। কৃষক ও শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষকবিরোধী, শ্রমিকবিরোধী, কৃষি বিরোধী, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার স্বার্থ বিরোধী এবং বৃহৎ শিল্পমালিকদের স্বার্থবাহী নীতি ও পদক্ষেপের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম বাদে রাজ্যে রাজ্যে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন ছাত্র-যুব-মহিলা, রাজ্য সরকারী কর্মচারী, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী, আশা কর্মী, মিডডে মিল কর্মী, ব্যাংক, বিমা, রেল, বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের কর্মীসহ দেশের নানা অংশের মেহনতী মানুষ। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে এরাজ্যের ক্ষেত্রে এইদিনে এই কর্মসূচী পালিত হয়নি। এদিন দেশের বেশীরভাগ রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে কৃষিকাজ ছিলো স্তব্ধ। ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তা সহ একগুচ্ছ দাবীতে এদিন তাঁরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। কয়লা, সড়ক পরিবহন ক্ষেত্র, এনএমডিসি, ভেল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিক, কর্মচারীরা ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। বিক্ষোভ, মিছিল থেকে দাবী উঠেছে কেন্দ্রের সরকারের পরিবর্তনের। মহারাষ্ট্রের শিল্পতালুক কিংবা তামিলনাড়ুতে তুতিনকোরিন বন্দর - ধর্মঘট ছিলো সর্বাত্মক। ধর্মঘট সর্বাত্মক ছিলো কেরালাতেও। এদিনের গ্রামীণ ভারত বনধ ও শিল্পভিত্তিক ধর্মঘট সফল করায় দেশের কৃষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের মানুষকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা এবং কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির যৌথমঞ্চ। □

দীপঙ্কর বাগচী

হাইকোর্টের রায়ে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারিতে ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির দায়ে কলকাতা হাইকোর্টে দোষী সাব্যস্ত হলো রাজ্য সরকার। ২০১৬ সালের স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্টের (এস এল এস টি) মাধ্যমে নিযুক্ত ২৫ হাজার ৭৫৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিল আদালত। ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ শব্বর রশিদির বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ এস এস সি-র শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় এই রায় দিয়েছে। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে, এই মামলায় সিবিআই তদন্ত বহাল থাকবে এবং প্যানেল বহির্ভূত যে সমস্ত অতিরিক্ত নিয়োগ হয়েছে এবং সুপার নিউমেরিক পদে যে নিয়োগ হয়েছে, তা সম্পূর্ণ বেআইনি। প্যানেল বহির্ভূত নিয়োগের ফলে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের সমস্ত বেতন ১২ শতাংশ সুদ সহ ৪ সপ্তাহের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। এই অর্থ আদায়ের জন্য জেলার জেলাশাসক ও জেলার শিক্ষা আধিকারিককে ৬ সপ্তাহ সময় দিয়েছে আদালত। সুপার নিউমেরিক পদ (অতিরিক্ত পদ) যাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন এবং এই কাজে যে সমস্ত সরকারি আধিকারিক যুক্ত ছিলেন, তাঁদের হেপাজতে নিয়ে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে। লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন আদালতের এই রায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর সীমাহীন দুর্নীতির অভিযোগকেই সত্যি বলে প্রমাণ করলো। ওই দিন হাইকোর্টের রায়ের পর প্রখ্যাত আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন, রাজ্য সরকার আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে এবং এই সরকারের আমলে যে সমস্ত নিয়োগ হয়েছে, তার সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি রয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের এই দুর্নীতি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। মানুষের বোঝা উচিত, কোন দলকে তাঁরা ক্ষমতা দিয়েছেন এবং এই দল ক্ষমতায় থাকলে রাজ্যের অবস্থা কী হবে।

পরবর্তীকালে এই রায়ের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গেলে সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়ে এই ২৫৭৫৩ জন শিক্ষকের চাকরি আপাতত বহাল থাকছে। এই মামলায় সিবিআই তদন্ত বজায় রেখে সুপ্রিম কোর্ট ১৬ জুলাই পরবর্তী শুনানির তারিখ স্থির করেছে। তবে এইসব শিক্ষকদের এই মর্মে মুচলেখা দিতে হবে যে, চাকরিতে অযোগ্য প্রমাণ হলে বেতনের টাকা তাঁরা ফেরত দেবেন। কলকাতা হাইকোর্টের দেওয়া চাকরি বাতিলের নির্দেশের ওপর শর্তাধীন অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ জারি করে শীর্ষ আদালত বলেছে, যোগ্য ও অযোগ্যদের দ্রুত বাছাই করতে হবে এবং এই বাছাই পর্ব সারতে হবে ৭০ দিনের মধ্যে। □

ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরী

মন্দির রাজনীতির স্বরূপ

সুমিত ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক আগেই ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করা হয়েছিল তৎকালীন ভারতবর্ষকে। বলা যায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির এটাই ছিল পূর্ব শর্ত। অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও এটা ঠিক যে, সাধারণ মানুষ না চাইলেও, কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা নিজ নিজ অবস্থানগত তাগিদ থেকেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই পরিকল্পনাকে মেনে নিয়েছিলেন। যদিও তার নিদারুণ মূল্য চোকাতে হয়েছিল সাধারণ মানুষকেই। ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা, পিতৃপুরুষের ভিটে-মাটি ছেড়ে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুতে পরিণত হওয়া—এইভাবেই এসেছিল স্বাধীনতা। কিন্তু তার পরেও, ভয়াবহ সময়কে পেছনে ফেলে ভারতে যাঁরা থেকে গেলেন এবং যাঁরা এলেন—সকলেই আশায় বুক বেঁধেছিলেন। ভেবেছিলেন বহু প্রতীক্ষিত স্বাধীনতা যখন এসেছে, যখন বহু মূল্য চুকিয়ে এই স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, তখন রাষ্ট্রের কর্ণধাররা উপযুক্ত যত্ন নিয়েই সেই স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে। স্বাধীন দেশটাও গড়ে তোলা হবে, সাধারণ মানুষ তথা খেটে খাওয়া মানুষের দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাকে লাঘব করার লক্ষ্য নিয়েই।

স্বাধীনতার পরে জাতীয় শিল্পনীতি, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ব্যঙ্ক-বীমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের জাতীয়করণ প্রভৃতির মাধ্যমে যে পথে এগনোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হল, তাতে সব মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উপায় না বের হলেও সামনের দিকে যে এগনোটা শুরু হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সংবিধান প্রণেতারা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করেছিলেন, তা হল সদ্য স্বাধীন নবগঠিত ভারত রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রেক্ষাপটের নিরিখে বিচার করলে এই সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মভিত্তিক হিংসা-দ্বেষের অন্ধকারকে অতিক্রম করে আলোর পথে যাত্রার সনদ।

ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিসম শব্দটির উদ্ভব ঘটেছে বহু আগেই। ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন এবং তৎপরবর্তী 'রেনেসাঁ'-র সময় থেকেই। আসলে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছিল ইতিহাসের এমন এক সন্ধিক্ষণে যখন ইউরোপের দেশে দেশে রাজতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। তাই রাজাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি, রাজার ধর্মই রাষ্ট্রের ধর্ম—এই ধারণাটার মূলেই আঘাত হানা হল। বলা হল রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না, রাষ্ট্রনীতি হবে সম্পূর্ণ ধর্মীয় প্রভাব এবং নিদানমুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ধারণা ইউরোপে সুসংহত রূপ নিল ফরাসী বিপ্লবের হাত ধরে। যখন উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করল। শুরু হল আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পথ চলা।

রাজতন্ত্রে রাজা এবং চার্চ প্রজাদের আনুগত্য লাভের জন্য, সম্মিলিতভাবে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত। কিন্তু বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তার আর প্রয়োজন রইল না। এখানে প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবর্তে শাসক নির্বাচনের দায়িত্ব নাগরিকদের হাতে তুলে দিল। এক কথায় বলা যায় 'প্রজা' থেকে 'নাগরিক' সত্ত্বায় উত্তরণের হাতিয়ার হল নির্বাচন করার রাজনৈতিক অধিকার। এই ব্যবস্থায় ধর্ম রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্থান নিল ব্যক্তি জীবনে।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা গড়ে উঠলেও, পুঁজিবাদের আঁতুর ঘর ব্রিটেনের শাসকরা এদেশে ঔপনিবেশিক শাসন পরিচালনা করতে গিয়ে ভারতীয় সমাজজীবনে বহু ধর্মের সহাবস্থানকে কৌশলে ব্যবহার করল মূল লক্ষ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে বিভাজন সৃষ্টি করা। প্রাক্ ব্রিটিশ ভারতীয় ইতিহাসকে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভাগ করা, ধর্ম ভিত্তিক পৃথক পৃথক নির্বাচনী এলাকা নির্ধারণ ইত্যাদি ছিল এই কৌশলের অঙ্গ। বলা বাহুল্য, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৃত্তে থাকা অথবা তার বাইরে থাকা একাংশের ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতির হোতারা এই ফাঁদে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির আকাঙ্খাতে জেনে বুঝেই পা দিলেন।

যার পরিণাম শুরুতেই বলা হয়েছে। স্বভাবতই স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা, ইউরোপের দেশগুলির মতো সমাজ বিবর্তনের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে উঠে আসেনি। এখানে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে যে মূল্য চোকাতে হয়েছে, তাকে যতদূর সম্ভব 'কমপেনসেন্ট' করা এবং সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে 'ধর্মনিরপেক্ষতা'-র ধারণাকে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রনীতির অন্যতক বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। যা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ ছটি প্রধান ধর্ম এবং বহু উপধর্মের মানুষের বাস এদেশে। বিশেষত যে দুটি ধর্মকে কৌশলে রাজনীতির দাবার বোর্ডে বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করে দেশভাগ করা

হয়েছিল, সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতিকে উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে থেকে যত দ্রুত মোছা সম্ভব সেই লক্ষ্য নিয়েই ধর্ম নিরপেক্ষতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ধর্মীয় পরিচিতি ভিত্তিক একাধিক সংখ্যালঘু অংশের আস্থা অর্জনের জন্যই সম্ভবত 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র যে ব্যাখ্যা সংবিধান প্রণেতারা হাজির করলেন, তা অন্তর্বস্তুগত দিক থেকে ইউরোপীয় সংজ্ঞার থেকে অনেকটাই আলাদা। রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকবে না—সরাসরি একথা না বলে জোরটা দেওয়া হল—রাষ্ট্র সব ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করবে। একাংশের ইতিহাসবিদদের মত হল, সংবিধানের এই ঘোষণা সেই সময়ের নিরীখে অত্যন্ত প্রগতিশীল ধারণা হলেও, একটা সূক্ষ্ম ফাঁক থেকে গেল। কারণ রাষ্ট্রের আচরণে ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বকে পরিহার করা হলেও, নির্বাচনী রাজনীতিতে 'সংখ্যা'-র গুরুত্ব সর্বাধিক। স্বভাবতই ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে যে সংখ্যাগুরু অংশ, তারা দলীয় রাজনীতিতে অগ্রাধিকার পেতে শুরু করল।

আবার এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বীদের শুধুমাত্র ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করার কুটকৌশলও শুরু হল। উন্নয়নের মূল স্রোতে যুক্ত করে, 'মিলিবে-মেলাবে'-র প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ তাৎপর্যকে পুষ্ট করার পরিবর্তে, গোষ্ঠী বা 'ব্লক' হিসেবে জনসমাজে টিকিয়ে রাখার কাজটা অঘোষিত ভাবে হলেও, যত্ন সহকারেই বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সেই কাজটা করা শুরু হল।

দেশভাগের যন্ত্রণা, 'র‍্যাডক্লিফ' লাইনের ধাক্কায় এক লহমায় সবকিছু হারিয়ে ছিন্নমূল মানুষে পরিণত হওয়ার হতাশা পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি করেই রেখেছিল। সংবিধানের নির্দেশিকার প্রকৃত বাস্তবায়ন এই অবিশ্বাসকে দূর করে সৌহার্দ ও সম্প্রীতির আবহাওয়া গড়ে তুলতে পারত। মুখে মুখে তেমনটা যে বলা হয়নি, তা নয়। বলা হয়েছে। কিন্তু কাজে অগ্রাধিকার পেয়েছে ভোট রাজনীতির অঙ্ক। ফলে শুরুর অবিশ্বাস সময়ের সাথে সাথে গভীরতর না হলেও, একেবারে শুকিয়েও যায়নি। ধর্মব্যবসায়ীদের একাংশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্নে লক্ষ্যপূরণে সফল হলেও, অপর অংশটি এদেশের বুকে সফল হয়নি। ব্যর্থতাজনিত তীব্র ক্ষোভ আর অসন্তোষ থেকেই তারা গান্ধীজীকে হত্যা করে। কিন্তু এর ফলে তারা আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আদায় করা তো দূরের কথা, রাষ্ট্র কর্তৃক জারি করা নিষেধাজ্ঞার খাঁড়া নেমে আসে আর এস এস-র ওপর। ভোল পালটে, সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুখোশ পরে নিষেধাজ্ঞা তোলার ব্যবস্থা করতে পারলেও সমাজে অনেকাংশে অপাংক্তেয়ই থেকে গেছিল তারা। তবুও একথা অনস্বীকার্য, প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চার অভাবে, পারস্পরিক অবিশ্বাসের রেশ কিছুটা থেকে যাওয়ার ফলে, কোণঠাসা হলেও টিকে থাকার মতো রসদ সমাজ জীবন থেকে সংগ্রহ করতে তাদের অসুবিধা হয়নি।

গত শতাব্দীর আশি ও নব্বই দশকের দুটি ঘটনা, তাদের গা ঝাড়া দিয়ে খোলস থেকে বেরোতে সাহায্য করল। প্রথমত, মুসলিম রমণী শাহবানুর খোরপোশের দাবিকে সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিলেও, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মুসলিম মৌলবাদীদের চাপে, আইন পাশ করে খোরপোশের দাবিকে বাতিল করে দেন। দ্বিতীয়ত, প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং-এর আমলে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী করার মাধ্যমে অন্যান্য অনগ্রসর অংশের জন্য সংরক্ষণের যে সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছিল, তাকে কেন্দ্র করে উচ্চবর্ণের মধ্যে সংরক্ষণ বিরোধী প্রচারকে ভিত্তি করে নতুন করে জমি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে আর এস এস ও তার রাজনৈতিক শাখা। অবশ্য তারও আগে জরুরি অবস্থাকালীন সময়ে স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণআন্দোলনে মিশে গিয়ে সামাজিকভাবে যে ব্রাত্য দশার মধ্যে তারা ছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং নিজেদের রাজনৈতিক শাখার নয়া নামকরণ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের বৃত্তে ফিরে আসে। এগুলি ঘুরে দাঁড়ানোর বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তারা ঘুরে দাঁড়ালো নব্বই দশকের গোড়া থেকে, অর্থাৎ নয়া উদারবাদী অর্থনীতি চালু হওয়ার পরবর্তী পবে। ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদের ধ্বংসসাধন নিছক সমাপতন ছিল না। আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি, দেশি-বিদেশী কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থে নয়া উদারবাদের জমি প্রস্তুত করার জন্যই মন্দির-মসজিত বিতর্ককে উস্কে দিয়ে, সংবিধানের মূল ভাবনা বিপরীত অবস্থানে গিয়ে ধর্মকে রাজনীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়েছিল। কারণ জনকল্যাণকামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সরকারের জনসমাজের প্রতি যে দায়, নয়া উদারবাদের মূল কথা হল সরকারকে তার থেকে সরে আসতে হবে। এর ফলে জনরোষ সৃষ্টির যে আশঙ্কা থাকে, তাকে মোকাবিলা করার জন্যই ধর্মভিত্তিক বিভাজনকে সামনে নিয়ে আসা হল। একে ঠেকানোর জন্য ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি যে দায়বদ্ধতা নিয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল, একমাত্র বামপন্থীরা ব্যতীত আর কেউই সেই দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়াতে পারল না। কারণ দক্ষিণপন্থী দলগুলি কোনোদিনই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করেনি। বরং ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা ভোটের পাটিগণিতেও সংখ্যাগুরু বলে, বহু আঞ্চলিক দল ধর্মব্যবসায়ীদের নয়া রাজনৈতিক প্রকল্পের অংশীদার হয়ে পড়ল।

২০০৮-০৯-এর পুঁজিবাদের পৃথিবীব্যাপী মহা সঙ্কটের পরে আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের বিশাল বাজারে আরও বেশি গেঁড়ে বসার প্রয়োজন অনুভব করল। তাই এই পর্বে তাদের প্রয়োজন হল এমন এক শক্তিকে যারা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ রকম বিরোধী। যারা লগ্নীপুঁজির সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিনিধি হিসেবে জনগণের ওপর স্বৈরতন্ত্রের বুলডোজার চালাতে পারে। ঠিক এই সময়ে আমাদের দেশে যা ঘটছে, তা হল লগ্নীপুঁজি ও কর্পোরেট পুঁজির সাথে ধর্মব্যবসায়ীদের গাঁটছড়া বাঁধার পরিণাম। একদিকে ইলেক্টোরাল বন্ড, অপরদিকে সংবিধানে শপথ নেওয়া দেশের প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে ঘৃণা ভাষণ—এই দুটিকে পাশাপাশি রাখলে এই 'নেক্সাস' বুঝতে অসুবিধা হয় না।

এই পরিস্থিতিতে চলমান রাজনৈতিক সংগ্রাম এই কুচক্রীদের হাত থেকে দেশ ও দেশের সংবিধানকে বাঁচানোর লড়াই। বামপন্থীরা সীমিত শক্তি নিয়ে এই লড়াইয়ে শুরু থেকেই রয়েছে। সুখের কথা হল দক্ষিণপন্থী সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলি বিপদটা উপলব্ধি করে একজোট হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস দ্বিমুখী দানবকে পরাভূত করার কাজটা এবার সম্পন্ন হবেই। □

মন্দির-মসজিদ নয়, মানুষ ফিরছে জীবন যন্ত্রণার প্রশ্নে

একটি বেসরকারী সংস্থা এই সময়কালে কিছু সমীক্ষার কাজ করেছেন, নির্বাচন সংক্রান্ত গবেষণা করা একই সঙ্গে সমীক্ষার কাজও তারা করে থাকেন। তবে এই সংস্থা সমীক্ষার কাজে যুক্ত করে দেশের বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার অধ্যাপকদের। তাই এই সমীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা অনেকটাই বেশি। এই সমীক্ষার মতামত দিয়েছেন ১০, ০১৯ জন ব্যক্তি। ১৯টি রাজ্যের ১০০টি লোকসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ১০০টি বিধানসভা ক্ষেত্রের ৪টি করে বুথে চালানো হয়েছে এই সমীক্ষা। কী পাওয়া গেল এই সমীক্ষায়—

● এই সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ''৫০ শতাংশের বেশি ভোটার ভাবছেন মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্ব—এই দুটোই হবে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনী ইস্যু। আমাদের মতো যাঁরা মনে করেন দুটোই সাধারণ মানুষের জন্য অপরিহার্য বিষয়, তাঁরা প্রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেন। দেখা যাচ্ছিল মন্দির হয়ে উঠছে প্রধান বিষয়। এখনও বহু ভোটার গুরুত্ব দিচ্ছেন মন্দিরকেই। কিন্তু যাঁরা মূল্যবৃদ্ধি এবং বেকারত্বকে গুরুত্ব দেন, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে।''

● ''নির্বাচন কমিশনকে মানুষ যতটা শ্রদ্ধা করত, এখন নাকি আর ততটা করে না। যাঁরা ভাবেন, কমিশন একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়, তাদের সংখ্যা পাঁচ বছরে ৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৯ শতাংশ।'' এক দিক থেকে দেখলে এই সমীক্ষায় কমিশনের অস্বস্তির কারণ নেই। কারণ ৯ শতাংশ এমন কিছু বড়ো অনুপাত নয়। কিন্তু বৃদ্ধির হার যথেষ্ট উদ্বেগজনক। আগে দেখা গিয়েছে ৫০ শতাংশের বেশি ভোটার কমিশনের কাজের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই অনুপাত নেমে এসেছে ২৮ শতাংশে। এটা অবশ্যই বিপদজনক।

● সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে ''৬২ শতাংশ ভোটারের মতে চাকরি পাওয়া ক্রমাগত কঠিন হয়েছে। মাত্র ১২ শতাংশ মনে করেন যে, চাকরি পাওয়া সহজ হয়েছে।''

● ''৫০ শতাংশ মনে করেন, গত পাঁচ বছরে দেশে দুর্নীতি বেড়েছে। এজন্য কেন্দ্রকে দায়ি করেন ২৫ শতাংশ। রাজ্যকে দায়ি করেছেন ১৬ শতাংশ।''

● ''আমার মতে, এই সমীক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিল, ভারত দেশটা কি শুধুই হিন্দুদের? না কি সব ধর্মের নাগরিকের দেশের ওপর সমান অধিকার। জবাবে ৭৯ শতাংশ বলেন ধর্ম যাঁর যাই হোক, দেশে সব নাগরিকের সমান অধিকার। শহরাঞ্চলে তাঁদের অনুপাত ৮৫ শতাংশ। শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এই অনুপাত ৮৩ শতাংশ। তাছাড়াও ৫৬ বছরের বেশি বয়সীদের মধ্যে মাত্র ৭৩ শতাংশ এই কথা বলেছে। কিন্তু ১৮ থেকে ২৫ বছরের যুবক-যুবতীদের ৮১ শতাংশের এই অভিমত অর্থাৎ নতুন প্রজন্ম আসুক। শিক্ষার বিস্তার হোক। নগরায়ন হোক। তাহলেই হিন্দু-মুসলমানকে ধর্মের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।'' □

আনন্দবাজার অনলাইন, ১২ মে, ২০২৪

অধিকার প্রয়োগের পূর্বে যা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন

সংসদীয় গণতন্ত্র আক্রান্ত

● সংসদীয় গণতন্ত্রে—সরকারকে সংসদে জবাব দিতে হয়। এখানে গৃহীত বিল আইন হয়। মোদি সরকারের সময় সংসদ বসার দিনের সংখ্যা বিপজ্জনকভাবে হ্রাস পেয়েছে।

১ম লোকসভার বার্ষিক গড় বসা—১৩৫ দিন

১৭তম লোকসভা (২০১৯-২০২৪) এই গড়—৫৫ দিন

● সংসদীয় কমিটিগুলিকে ব্যবহার না করা—এই সংসদ সংসদীয় কমিটিতে স্ক্রুটিনির জন্য বিল পাঠিয়েছে ১৩ শতাংশ।

২০০৯-১৪ এর হার ছিল ৭১ শতাংশ।

● বিরোধীদের কণ্ঠ রুদ্ধ করা—শেষ শীতকালীন অধিবেশনে ১৪৬ জন সাংসদকে বহিষ্কার

● আলোচনা ছাড়া বাজেট পাশ—

গড়ে ৮০ শতাংশ বাজেট।

২০২৩ সালে ১০০ শতাংশ বাজেট। □

গণতান্ত্রিক অধিকার আক্রান্ত

● সংবিধানের ১৯ নং ধারা—নাগরিকদের মত প্রকাশ, সংগঠিত হওয়া, আন্দোলন করার স্বাধীনতা দিয়েছে। উল্টোদিকে হেঁটেছে মোদি সরকার।

● **Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)**—২০১৯ সাল, সংশোধন করে আরও ভয়ঙ্কর করা হয়েছে একে।

UAPA-তে গ্রেপ্তারী—২০১৫ থেকে ২০১৯-এ বৃদ্ধি ৭২ শতাংশ। এর মধ্যে ৯৮ শতাংশ জামিন না পেয়ে জেলে আছে।

মোদির আমলে ২০২১—৮১৪ কেস, ২০২২—১০০৫ কেস, মোট ৮৯৪৭ জন গ্রেপ্তার, চার্জশীট ৬৫০৩ জনকে।

কারা গ্রেপ্তার—রাজনৈতিক, সামাজিক কর্মী, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক, যারা সরকারের নীতির বিরোধিতা করেছে।

● স্বাধীন গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ইউ এ পি এ-র হুমকি।

নিউজ ক্লিকের সম্পাদক প্রবীর পুরকায়স্থ এখনও গ্রেপ্তার আছেন।

● দেশদ্রোহীতার নামে আক্রমণ।

২০১৮-২০২২—৭০১টি দেশদ্রোহের কেস। মোট কেসের ৯৮ শতাংশ মোদি ক্ষমতায় আসার পর।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অকার্যকর রয়েছে এই ধারা। কিন্তু নতুন ক্রিমিনাল কোড-এ নবরূপে বিষয়টি আনা হয়েছে। □

মিডিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ এবং গদি মিডিয়া

● এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে **Telecomunication Act, IT Amendment Rules, Boradcasting Bill.**

● বৃহৎ কর্পোরেটদের একচেটিয়া দখল—মুকেশ আম্বানী ৭২টি টিভি চ্যানেলের মালিক, তার দর্শক-৮০০ মিলিয়ন। আদানীরাও মালিকানা বাড়াচ্ছে।

● **World Press Freedom Index**—ভারতের স্থান ১৮০টি দেশের মধ্যে ১৬১তম।

● ১৭টি নিউজ চ্যানেলের মালিক মুকেশ আম্বানি এবং ১১টি নিউজ চ্যানেলের মালিক গৌতম আদানি। আর আপনি ভাবছেন টিভিতে সত্য খবর দেখছেন! শত-শত কোটি টাকা প্রতিদিন খরচ হচ্ছে আপনার ও আমার ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য। তাই আমরা যেসব খবর প্রতিনিয়ত দেখছি, তার সিংহভাগই হয় অসত্য, নয়তো বিকৃত। আপনি সতর্ক না থাকলে সেই সব খবর আপনার অজান্তেই আপনার মগজ ধোলাই করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। □

আক্রান্ত স্বাধীন বিদেশনীতি

● গাজায় যুদ্ধ বিরতি পর্যন্ত চাইল না ভারত! সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিল না ভারত। কোথায় গেল তৃতীয় বিশ্বের দেশ ভারতের জোটনিরপেক্ষ অবস্থান? বেমালুম পালটে গেল নাকি স্বাধীনতার পর থেকেই নেওয়া ভারতের বিশ্বশান্তির পক্ষে অবস্থান? আমাদের গর্বের দেশটা কি সাম্রাজ্যবাদের অনুগামী হয়ে গেল? □

নজরদারী রাষ্ট্র

● পেগাসাস দেখিয়ে দিয়েছে নজরদারী কতটা সর্বোচ্চ মাত্রায় রয়েছে।

● নজরদারী সহ **Central Monitoring System, Network Traffic Analysis, NAT, GRID, ICJS** ইত্যাদি সংস্থাকে ব্যবহার করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

সম্প্রতি গৃহীত **Post Office Act** বলছে সন্দেহজনক মনে করলে যে কোনো পার্সেল খোলা যাবে।

● সরকারী নির্দেশে ইন্টারনেট দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ করার ক্ষেত্রে ভারত এখন বিশ্বে প্রথম। ২০২২-এ ৮৪টি এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। □

Unitary system-এ প্রবর্তনের চেষ্টা

ভারত—Union of States

যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা—ভারতের গণতন্ত্রে অন্তর্নিহীত এবং সেটা ভারতের সব ধরনের বৈচিত্র্যকে ধারণ করে।

একে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চলছে।

জম্মু ও কাশ্মীরকে টুকরো করে দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, ৩৭০ ধারা বাতিল যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার উপর আঘাত।

● রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ ঘটেছে বিরোধী শাসিত রাজ্যের এক্তিয়ারে।

● রাজ্যের এক্তিয়ার ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়ে হস্তক্ষেপ কেন্দ্রের।

● একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালুর প্রয়াস।

● এক দেশ এক ভোট নীতি কার্যকরী করার প্রচেষ্টা।

● বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা—ভারতের গণতন্ত্রের অবক্ষয়ের কথা বলেছে।

● **Freedom House** নামক একটি সংস্থা যারা তিনটি ভাবে কোনো দেশের গণতন্ত্রকে বিচার করে। সেগুলি হল—

Free—Partly Free—Not Free

ভারতকে **Partly Free** পর্যায়ে রেখেছে।

একই বছর **Variety of Democracy (V-Dem)** সংস্থাতে

ভারতের স্ট্যাটাস—**Electoral Autocracy**

Economist Intelligence Unit নামক সংস্থা বলছে ভারতে **Flawed Democracy** চলছে। □

দুর্নীতির রাষ্ট্রীয়করণ

১৩০০ সংস্থা মোট ১২ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে।

প্রথম স্থানে বিজেপি ৬০৬০ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা।

দ্বিতীয় স্থানে তৃণমূল কংগ্রেস ১৬০৯ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা (২১১ জন দাতা, এর মধ্যে ৫৪২ কোটি টাকা দিয়েছে একটি লটারি সংস্থা)।

● মামলা শুরু হয় সুপ্রিম কোর্টে ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, রায় প্রদান ১১ মার্চ, ২০২৪

● বিজেপিকে অধিকাংশ বন্ড দিয়েছে Megha Engineering and Infrastructures Ltd (MEIL), হায়দরাবাদের কোম্পানী (৫১৯ কোটি)। এরা থানে-বোরিভালি সুরঙ্গ প্রজেক্টের জন্য দুটি আলাদা প্যাকেজ দেয়—১৪,৪০০ কোটি টাকা। চুক্তির আগে বন্ডের মাধ্যমে প্রচুর টাকা বিজেপির ফান্ডে দেয়।

● Zojila Road Tunnel Project—খনন সংস্থা যারা বনাঞ্চলে এই প্রোজেক্টের জন্য ছাড়পত্র পায়—বিনিময়ে বিপুল টাকা বন্ডে।

● ঔষধ কোম্পানি—৩৫টি, ১০০০ কোটি টাকা দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৭টি কোম্পানি পাওয়া গেছে, যাদের বিরুদ্ধে খারাপ মানের ঔষধ তৈরির জন্য তদন্ত চলছিল।

● Shell কোম্পনিগুলিকে ব্যবহার।

এই ধরনের কিছু কোম্পানি কোনো লাভ করেনি, কিন্তু কোটি কোটি টাকার বন্ড কিনেছে।

কিছু কোম্পানী গত চার বছরের লাভের বেশি অঙ্কের টাকার বন্ড কিনেছে।

● বণিকসভা FICCI, CII, Assocham যৌথভাবে সুপ্রিম কোর্টে চিঠি লিখেছিল Unique I.D প্রকাশ না করার জন্য। সুপ্রিম কোর্ট পাত্তা দেয়নি।

● আর এস এস-র তিনদিনের অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার শেষে সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসাবালে এই দুর্নীতির পক্ষে দাঁড়িয়ে বলেন "ইলেক্টোরাল বন্ড পরীক্ষামূলক ছিল, যে কোনো পরিবর্তনে প্রশ্ন ওঠে, ইভিএম চালুর সময়েও উঠেছিল।"

● দুর্নীতি—টিএমসি-বিজেপি এক নৌকায়।

● টিএমসি-কে সর্বোচ্চ টাকা দিয়েছে লটারি কিং-এর সংস্থা ফিউচার গেমিং এন্ড হোটেল সার্ভিসেস (তামিলনাড়ু) প্রাইভেট লিমিটেড—৫৪২ কোটি টাকা দিয়েছে এরা।

● টিএমসিকে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার হলদিয়া এনার্জি সংস্থা বন্ডের মাধ্যমে ২৫১ কোটি টাকা দিয়েছে।

● তৃণমূলে বন্ডের টাকা ২০২১-এ জেতার পর বৃদ্ধি। ২০১৯—৭০ কোটি টাকা, অক্টোবর-নভেম্বর ২০২০ থেকে জানুয়ারি ২০২১—৪৩.৪ কোটি টাকা, ২০২১-এর ভোট পর্যন্ত ১৭১টি বন্ড—৫৫ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। মে ২০২১ তৃতীয়বার জেতার পর দু'মাসে ৩৩৭টি বন্ডে ১০৭ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। অক্টোবর, ২০২১—১৪২ কোটি টাকা, জানুয়ারী ২০২২—২২৪ কোটি টাকা, ২০২৩—৫৬২ কোটি টাকা।

● তেলেঙ্গানার ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা অরবিন্দ ফার্মা এপ্রিল ২০২১ থেকে নভেম্বর ২০২৩-এর মধ্যে ৯৯ কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কেনে। যার ৯৯ শতাংশ বিজেপি পায়।

এই অরবিন্দ ফার্মার মদ বিক্রীর ব্যবসাও আছে। এই সংস্থার একজন কর্তা পি সরথ চন্দ্র রেড্ডি ১০ নভেম্বর ২০২২ দিল্লী লিকার পলিসি কেসে গ্রেপ্তার হয়। গ্রেপ্তার হবার ৫ দিন পর অরবিন্দ ফার্মা বিজেপিকে ৫ কোটি টাকা ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে দেয়। জুন, ২০২৩-এ দিল্লীর একটি কোর্ট রেড্ডিকে রাজসাক্ষী করার জন্য অনুমোদন দেয় এবং মুক্ত করে। নভেম্বর ২০২৩-এ অরবিন্দ ফার্মা তার অন্যান্য সহযোগী সংস্থা সহ আরও ৫০ কোটি টাকা বিজেপিকে ইলেক্টোরাল বন্ডের মাধ্যমে প্রদান করে।

● ইলেক্টোরাল বন্ডের সর্বোচ্চ ক্রেতা হল ফিউচার গেমিং অ্যান্ড হোটেল সার্ভিসেস। এই সংস্থার মালিক কোয়েম্বাটোরের সান্টিয়ানো মার্টিন ভারতের 'লটারি কিং' নামে খ্যাত। এই সংস্থা বেশ কিছু বছর ধরে ইডি ও সিবিআইয়ের নজরে রয়েছে। এরা এপ্রিল ২০১৯ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ১৩৬৮ কোটি টাকার বন্ড ক্রয় করেছে। সর্বোচ্চ টাকা পেয়েছে এই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস (৫৪২ কোটি টাকা)। ডিএমকে, কংগ্রেস, বিজেপি সহ বেশ কিছু দলকে এরা টাকা দিয়েছে। এসবিআই সুপ্রিম কোর্টের ধাতানি খেয়ে আলফা নিউমারিক কোড নির্বাচন কমিশনকে দেওয়ার পর প্রকৃত তথ্য সামনে আসে। কিন্তু এই কোড এসবিআই দেওয়ার আগেই ডিএমকে, এনসিপি সমাজবাদী পার্টি, আপ সহ একাধিক দল তাদের বন্ড সংক্রান্ত পূর্ণ তথ্য ইলেকশন কমিশনের কাছে জমা দেয়। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বা বিজেপি কেউই এই সৎ সাহস দেখাতে পারেনি।

● পুনাওয়ালা পরিবার চালিত পুনের সিরাম ইনস্টিটিউট অব ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, যারা কোভিড-১৯-এর টীকা কোভিশিল্ডের সর্বোচ্চ প্রস্তুতকারক গোটা দেশে তথা বিশ্বে। এই সংস্থা ইলেক্টোরাল বন্ড ছাড়াও করছাড় যুক্ত ইলেক্টোরাল ট্রাস্টের মাধ্যমেও বিজেপিকে টাকা দিয়েছে। কোভিডের দ্বিতীয় তরঙ্গের পর আগস্ট, ২০২২-এ তিনটি খেপে এই সংস্থা ৫০.২৫ কোটি টাকা প্রুডেন্ট ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট (পূর্বের নাম সত্য ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট)-কে প্রদান করে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই টাকা বিজেপির ফান্ডে যায়। শুধু ইলেক্টোরাল বন্ড নয়, বিভিন্ন ইলেক্টোরাল ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে ২০১৩ থেকে ২১৭৬ কোটি টাকা বিভিন্ন সংস্থা টাকা দিয়েছে। যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ বিজেপিতে গেছে।

● পি এম কেয়ার ফান্ড তৈরি করা হল করোনার সময় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থাকা সত্ত্বেও। মহামারি চিকিৎসা ও অন্যান্য সহযোগিতার নামে তৈরি হল এই ফান্ড। কয়েক হাজার কোটি টাকা জমা পড়ে। জাতীয় পতাকা, অশোক স্তম্ভ, প্রধানমন্ত্রীর নাম ও ছবি ব্যবহৃত হওয়ায় একে সরকারী তহবিল বলেই সাধারণ মানুষ মনে করে। কিন্তু আসলে এটি বেসরকারী ফান্ড। ২০২০ সালের মার্চ থেকে ২০২২ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই তহবিলে দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা এই ফান্ডে জমা দিয়েছে ২৩,২৩৭.৭ কোটি টাকা। ইলেক্টোরাল বন্ডে বিজেপি যা টাকা পেয়েছে তার প্রায় সাড়ে তিন গুণ। এই তহবিল থেকে তিন দফায় খরচ হয়েছে মাত্র ৯৭৪১ কোটি টাকা। এই টাকা দিয়ে ভেন্টিলেটর সহ যা কেনা হয়েছিল তার বেশিরভাগই অকেজো এবং কেনা হয়েছিল বিজেপি ঘনিষ্ঠ সংস্থাগুলি থেকে। খরচের হিসাব যদি ঠিক থাকে তাহলে অবশিষ্ট ১৩৪৬৬ কোটি টাকা কোথায় গেল জানাচ্ছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ অন্যান্যরা। □

কৃষক আত্মহত্যার রেকর্ড

● এন সি আর বি রেকর্ড বলছে ১৯৯৭ থেকে ২০২২ এই ২৫ মাসে কৃষিক্ষেত্রে ৩.৫ লক্ষ মানুষ আত্মহত্যা করেছে। এর মধ্যে ১০০৪৭৪ জন আত্মহত্যা করেছে ২০১৪ থেকে ২০২২ মোদি জমানার এই ৮ বছরে। প্রকৃত সত্য প্রকাশের ভয়ে ২০২২ থেকে এন সি আর বি-র কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়না।

কর্পোরেটদের ঋণ মকুব, কৃষকদের নয়

● জাতীয় স্তরে ঋণ মকুব প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছিল ২০০৮-এ। ২০১৪ থেকে আজ পর্যন্ত বিজেপি সরকার এরকম কোনো প্রকল্প চালু করেনি।

● বিজেপি জমানায় গত ১০ বছরে কর্পোরেটদের ১৫ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কগুলি মকুব করে দিয়েছে।

উল্টোদিকে রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের থেকে কৃষকদের ১৮ লক্ষ কোটি টাকা ঋণের এক টাকাও মকুব করেনি মোদি সরকার। □

স্টাডি টিম

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

মে-দিবস

থেকে যখন উদার অর্থনৈতিক নীতি ভারতবর্ষে জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে, একের পর এক রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা বিলগ্নীকরণ সহ সরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমতে শুরু করে। মুনাফাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ তুলে নিয়ে বিদেশী সংস্থাগুলোকে অবাধে বাণিজ্য করার সুযোগ করে দেওয়া হয়। পুঁজিপতিদের মুনাফাকে আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে শ্রমজীবী মানুষের ওপর নামিয়ে আনা হল একের পর এক আক্রমণ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে

সুমিত ভট্টাচার্য

মুনাফাকে পুঞ্জিভূত করার প্রক্রিয়া পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে। শ্রমজীবী মানুষ বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিরুদ্ধে নয়। এই অগ্রগতি মানুষের রুটি রুজির পথে বাঁধা না হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আজ শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে অস্বীকার করে আট ঘণ্টা কাজের পরিবর্তে ১৬ ঘণ্টা / ২০ ঘণ্টা কাজ করানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষ যাতে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ করতে না পারে সেইজন্য তাদের মধ্যে বিভেদের বীজন বপন করা হচ্ছে। শ্রমিক পরিচয়কে মুছে দিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে। সাংবিধানিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। শ্রমজীবী মানুষের পরিবর্তে অস্থায়ী নিয়োগ, শূন্যপদে নিয়োগ না করা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছেক। শিক্ষা এবং শিক্ষান্তের কাজ এই দাবি নিয়ে ছাত্র-যুবরা লড়াই করছে। ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন শুরু হয়েছে। কোন সরকার গঠিত হবে তার উপর নির্ভর করবে অনেক কিছু। দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট সরকার না শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের সরকার। আমাদের সেই নির্ণয়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। পরাস্ত করতে হবে এই সমস্ত অশুভ শক্তিকে, যারা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরন করেছে। যারা সংসদ সহ সংবিধানকে মান্যতা দিতে চায় না, যারা বিদেশী পুঁজির দালালি করে শ্রমজীবী মানুষের অস্থিমজ্জার ওপর দাঁড়িয়ে মুনাফার পাহাড় গড়তে চায়। শিকড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে এই শক্তিকে। ধর্মীয় উন্মাদনার আশ্রয় নিয়ে সাধারন মানুষের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে যারা রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ধরে রাখতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে আজ সোচ্চার হতে হবে। এই ভূমিকা যদি আমরা যথাযথভাবে পালন করতে পারি তবেই মে দিবসের স্বার্থকতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এরপর আজকের সভার মুখ্য বক্তা কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সহ সম্পাদক প্রবীর মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন ১৮৯০ সাল থেকে গোটা পৃথিবীতে এই দিনটি শ্রমজীবী মানুষ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসাবে প্রতিপালন করে আসছে। ১৮৮৯ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের ভিত্তিতে গোটা দুনিয়াজুড়ে মে দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৮৮৬ সালে যে চারজন কমরেড শ্রমজীবী মানুষের অধিকারকে সুরক্ষিত রাখার জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন তাদের স্মরণ করা হয় আজকের দিনে। রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষিত মানুষের লড়াই সংগ্রামের দিন হল মে দিবস। শ্রমজীবী মানুষের সাথে মধ্যবিত্ত কর্মচারী সমাজও এই লড়াইয়ে নিজেদেরকে যুক্ত করেছেন। পুঁজিবাদ আজ তীব্র মহামন্দায় আক্রান্ত। এই মহামন্দা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো উপায় পুঁজিবাদ খুঁজে পাচ্ছে না। পোপ বলছে, বসন্তের দিন শেষ হয়ে গেছে। ফুকুয়ামা বলছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্র শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করছি দুনিয়াজোড়া বৈষম্যের কোনো অবসান হয়নি। আমরা যারা বৈজ্ঞানিক মতবাদে বিশ্বাস রাখি তারা জানি পুঁজিবাদ তার জন্মলগ্ন থেকে সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই সঙ্কট তারা শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েও কোনো পরিত্রাণের পথ পাচ্ছে না। পৃথিবীতে সব থেকে বেশি যে বই বিক্রি হয় তা হল বাইবেল। তারপরেই আছে মার্কসের ক্যাপিটাল। ১৯৩০ সালের পুঁজিবাদের যে সঙ্কট তৈরি হয়েছিল তা ইন্ধন জুগিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। সেই সঙ্কট থেকে মুক্তি পাবার পথ বলেছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ কেইনস্। তিনি বলেছিলেন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে অর্থ ব্যয় কর ও তা মানুষের হাতে দাও। রাষ্ট্রের উদ্যোগে সমাজ কল্যাণমূলক ভাবনার শুরু হয়। কোভিডের সময় বা তার পরবর্তীকালে আমাদের দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদরা যখন বলছেন যে রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে মানুষের হাতে অর্থ তুলে দাও বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের মাধ্যমে। যাতে এই পরিস্থিতিতে মানুষ বেঁচে থাকার রসদ পায়। কিন্তু সেই কথা না শুনে বেল আউট প্যাকেজ দেওয়া হল বিভিন্ন কর্পোরেট সংস্থাকে। মানুষের হাতে অর্থ না দিয়ে কর্পোরেট হাউসগুলোকে বিপুল কর ছাড় দেওয়া হল। সারা দেশে চলছে লুঠ পাটের রাজত্ব। শিক্ষিত ছেলেরা রাস্তায় আন্দোলন করছে, টাকার বিনিময়ে চাকরি বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। আজ মে দিবসে আমাদের অঙ্গীকার করতে হবে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে শ্রমিক বিরোধী, কৃষক বিরোধী, জনবিরোধী এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী বর্তমান সরকারকে দেশে এবং রাজ্যে পরাস্ত করতে হবে। দেশের জনগণের স্বার্থরক্ষায় শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের লড়াইকে ঐক্যবদ্ধ করে মে দিবসের আহ্বানকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

এরপর সভাপতি মানস দাস তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে আজকের সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এরপর কর্মচারী ভবন থেকে একটি সুসজ্জিত মিছিল শহীদ মিনার ময়দান অভিমুখে এগিয়ে চলে। শহীদ মিনার ময়দানে বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিক কর্মচারী সংগঠনগুলোর উদ্যোগে শ্রমিক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভা পরিচালনা করেন দীপক সাহা (ইউ টি ইউ সি), সুভাষ

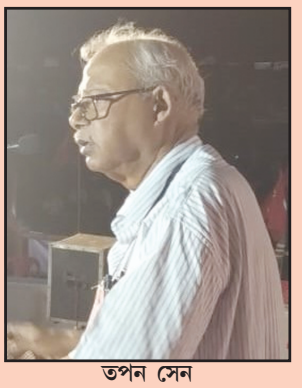

তপন সেন

মুখার্জী (সি আই টি ইউ), বাসুদেব গুপ্ত (এ আই টি ইউ সি), দেবদাস চ্যাপার্জী (টি ইউ সি সি), অশোক দাস (এ আই টি ইউ সি), শিশির রায় (বি এস এন এল), মনোজ সাউ (১২ই জুলাই কমিটি) ও অলোক দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। মে দিবসের তাৎপর্য উল্লেখ করে প্রস্তাব পেশ করেন সি আই টি ইউ পশ্চিমবঙ্গ কমিটির সাধারণ সম্পাদক অনাদি সাহু। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ'র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। তিনি বলেন আবেদন নিবেদনে কাজ হবে না। লড়াই করেই আদায় করে নিতে হবে শ্রমজীবীদের অধিকার। এটাই ঐতিহাসিক মে দিবসের শিক্ষা। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার শ্রমজীবীদের অধিকার কেড়ে নিতে নেমেছে। পাল্টা জবাব দিতে হবে এবারের লোকসভা নির্বাচনে। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ কোন পর্যায়ে যেতে পারে এবং স্পর্ধার লড়াইয়ের কাছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা তথা স্বৈরাচারী শাসককেও যে মাথা নত করতে হয় তার অজস্র উদাহরণ আমাদের দেশেও লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক সময়ে দুর্বার কৃষক আন্দোলন থেকে বিদ্যুৎ কর্মীদের নাছোড় বান্দা আন্দোলনের সাফল্য সেই দৃষ্টান্তকে তুলে ধরেছে। সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সুভাষ মুখার্জী, এ আই টি ইউ সি'র পক্ষে লীনা চ্যাটার্জী, ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে অশোক ঘোষ। এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষে স্বপন ঘোষ। টি ইউ সি সি-র পক্ষে প্রবীর ব্যানার্জী। বি এস এন এল'র ক্ষেত্রে অনিমেষ মিত্র ও ১২ই জুলাই কমিটির পক্ষে সুমিত ভট্টাচার্য, বেফির পক্ষে জয়দেব দাশগুপ্ত সহ শ্রমিক কর্মচারী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। □

সোমনাথ পোদ্দার

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

শাসকদলের সুর বদল

ঢেউ রয়েছে।

পাঁচ বছর আগে ২০১৯ সালে প্রথম দফায় ভোট পড়েছিল ৬৯.৪৩%, কিন্তু ১৯ এপ্রিল রাত ৯টা পর্যন্ত গোটা দেশে গড়ে ভোট পড়েছে ৬২.৩৭% বলে খবরে প্রকাশ। চূড়ান্ত হিসাবে তা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন কমিশন। বিজেপি তথা এনডিএ শাসিত মহারাষ্ট্রে (৫৫.৩৫%), বিহার (৪৮.৫০%), উত্তরপ্রদেশ (৫৮.৪৯%) ও রাজস্থানে (৫৬.৫৮%) ভোটের হার কিছুটা হলেও চিন্তায় রেখেছে বিজেপির একাংশকে। পাঁচ বছর আগে প্রথম দফা নির্বাচন থেকেই মোদি ঝড়ের যে পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়েছিল, এবার সে ঝড় এখনও দানা বাঁধেনি, তা স্পষ্ট। যা চিন্তার বলে মনে করছেন বিজেপির একাংশের নেতৃত্ব। আমাদের রাজ্যের তিন আসনেও ভোটের আগের দিন রাত্রি থেকেই কোচবিহারের দিনহাটা এবং আলিপুরদুয়ার কেন্দ্রের তুফানগঞ্জে বিজেপি ও তৃণমূলের হিংসায় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন এলাকাবাসীরা। ভোটের দিনও সকালে দিনহাটা, শীতলকুচির ছোটশালবাড়িতে আক্রান্ত হন ভোটাররা। বামপন্থীদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে মানুষ যাতে নির্ভয়ে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট নিজে দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনকেই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মণিপুরে গুলি চলেছে এদিনের ভোটে। ইভিএম, ভিভিপ্যাড মেশিন পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নাগাল্যান্ডের ৬টি জেলার কোনও বুথেই কেউ ভোট দেননি যা রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম। ত্রিপুরায় শাসকদল গায়ের জোরে ভোট করিয়েছে বলে অভিযোগ রাজ্যের বিরোধী দল বাম-কংগ্রেসের।

২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটেও গড়ে ভোট পড়েছে ৬১ শতাংশের কাছাকাছি, যা বিগত লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় পর্বের চেয়ে সাড়ে ছয় শতাংশ (৬৭.৬%) কম। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রথম দফার মতোই ভোটের হার কম দেখা গিয়েছে এনডিএ শাসিত রাজ্যগুলিতে। বিহার (৫৫%), মধ্যপ্রদেশ (৫৭.৬২%), মহারাষ্ট্রে (৫৪.৮%)। একমাত্র রাজস্থানে ভোট পড়েছে ৬৪% যা প্রথম দফার থেকে প্রায় সাত শতাংশ বেশি। এবারের ভোটে দেশের বিভিন্ন অংশে জাঠ-রাজপুত সমাজের ক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপিকে। রাজস্থানও তার ব্যতিক্রম নয়। দলের আশঙ্কা জাঠ-রাজপুতরা যদি বিজেপির বিরুদ্ধে দাঁড়ান, সেক্ষেত্রে ওই রাজ্যে গতবারের মতো সবক'টি আসন জেতা সম্ভব হবে না। এদিন কেরালার ২০টি আসনে ভোট পড়েছে ৭০ শতাংশের বেশি। বহু বুথে বেশ রাত পর্যন্ত ভোটাররা লাইনে ছিলেন ভোটদানের অপেক্ষায়। একইভাবে ত্রিপুরা পূর্ব আসনে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে (৭৯ শতাংশের ওপর)। কর্ণাটকে ৬৪ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৩টি আসনে ৭২ শতাংশ ভোট পড়েছে, জম্মু-কাশ্মীরে ৬৭ শতাংশ এবং মণিপুরে ভোটদানের হার ৭৭ শতাংশ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে দুই দফার ভোটগ্রহণের পরে দেশের রাজনৈতিক আবহে দ্রুত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। একদিকে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপি রক্ষণাত্মক হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে বিরোধী ইন্ডিয়া মঞ্চ অনেক আক্রমণাত্মক। ভোট ঘোষণার শুরুতে পরিস্থিতি ছিল পুরো বিপরীত। 'মোদি কী গ্যারান্টি', 'এইবার ৪০০ পার' শ্লোগান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন মোদি সহ বিজেপি নেতারা। অঙ্কে না মিললেও প্রচারের জোরে আবহ তৈরি করা হচ্ছিল, যেন চারশোর বেশি আসন পাওয়া সম্ভব তাদের। এর সঙ্গে পরিবারবাদ, দুর্নীতি, ২০৪৭ সালের বিকশিত ভারত ছিল মোদির প্রচারে। বিরোধীদের ইন্ডি বলে তাচ্ছিল্য করছিলেন। রামমন্দিরের নামেও ভোট চাইছিলেন।

পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে থাকে প্রাক্তন রাজ্যসভা সাংসদ ও বামপন্থী নেতা সীতারাম ইয়েচুরির সুপ্রিম কোর্টে করা ইলেক্টোরাল বন্ড নিয়ে মামলার পরবর্তীতে, কোর্টের রায়ে নির্বাচনী বন্ডের তথ্য সামনে আসার পর। গোদি মিডিয়া চাইলেও বিষয়টি মানুষের দৃষ্টি বাইরে পাঠাতে পারেনি। এইক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউবাররা দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের গ্রেপ্তার, রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির তদন্ত চলছিল, তাদের দলে নিয়ে সব তদন্ত বন্ধ করে দেওয়ার তথ্যও সামনে চলে আসে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় বামপন্থী সহ বিরোধীদের তোলা মূল দাবিগুলি যেমন গোটা দেশে বেকারি আর মূল্যবৃদ্ধিই জনতার মুখ্য চিন্তার কারণ। ২০১৪ সালের 'আচ্ছে দিন', ২০১৯ সালের পুলওয়ামার ঘটনার যে আবেগ তৈরি করতে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সফল হয়েছিল ২০২৪-এ রামমন্দিরের উদ্বোধনকে সামনে রেখে সেই আবেগ এখনও তৈরি করতে সফল হয়নি বিজেপি। ফলস্বরূপ প্রথম দফার ভোটের পরেই মোদি কৌশল বদল করে বিকশিত ভারতের প্রচার ছেড়ে দ্রুত হিন্দু-মুসলিম মেরুকরণের রাস্তায় চলে আসেন। সংবাদে প্রকাশ কোনও ব্যাখ্যা ছাড়াই তিনি দাবি করেন, কংগ্রেসের ইস্তেহার মুসলিম লীগের ভাবনায় তৈরি, বাকি অংশটা কমিউনিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত। এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পরবর্তীতে বলেন কংগ্রেস আপনাদের সম্পদ কেড়ে নেবে, মা-বোনেদের সোনা-গহনা এমনকি মঙ্গলসূত্রও কেড়ে নেবে। তারপর তা মুসলিমদের দিয়ে দেবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে কংগ্রেসের ইশতেহার নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে গিয়ে তিনি আসলে কংগ্রেসের সুবিধা করে দিয়েছেন। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে, মোদির বক্তব্যের জেরে কয়েকদিনের মধ্যেই প্রায় ৫০ লক্ষ লোক কংগ্রেসের ইশতেহার ডাউনলোড করেছেন। যারা এই ইশতেহার নিয়ে আগ্রহী ছিলেন না তারাও জেনে গেছেন এই ইশতেহারে দেশজুড়ে বিপুল বৈষম্যের শিকার আমজনতার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব রয়েছে। বিশেষত মহিলাদের বছরে ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বড় ধরনের প্রভাব ফেলছে। বামপন্থীরা তাদের ইশতেহারে ব. ঃ টি - ব. ঃ জি, বেকারি - বেরোজগারি, কৃষক-শ্রমিকের সমস্যা, মূল্যবৃদ্ধির বিষয়কে তুলে ধরে এগুলোকে নিরসনে প্রয়োজনীয় দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার দায়িত্ব দৃঢ়তার সাথে পালনের কথাও ঘোষণা করেছে। পাশাপাশি সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি-র মতো বিরোধীরা তাদের ইশতেহারের কেন্দ্রে রেখেছে রোজগার এবং মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয়গুলিকে।

স্বাভাবিকভাবেই দু'দফা ভোটের পরে বিপর্যয়ের ইঙ্গিতে দিশেহারা বিজেপি রুটি-রুজির প্রশ্নকে ভুলিয়ে দিতে মেরুকরণের পুরনো তাসকেই ব্যবহার করতে চাইছে, কারণ তৃতীয় দফা ভোটের আগে (৭ মে ভোট ৯৪টি আসনে) যদি মোদি গ্যারান্টি কাজ না করে, তাহলে অর্ধেকের বেশি আসনে হয়ে যাওয়া ভোটে ৪০০ পার-এর ফাঁকা আওয়াজ হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে যাবে। একই সঙ্গে মোদি এবং শাহকে রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বলে বেড়াতে হচ্ছে, আমরা ফিরলে সংবিধান বদল হবে না। সংরক্ষণে হাত দেওয়া হবে না, কিন্তু পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে গেছে বলে মনে করছেন মোদি-শাহরা যে আরএসএস প্রধানকে আসরে নামতে হয়েছে সংরক্ষণ নিয়ে সাফাই দিতে।

আমাদের রাজ্যেও বিগত লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনের মতোই বিজেপি-তৃণমূলের বাইনারী তৈরি করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়েছে এই দুই দল তথা ইলেকট্রনিক্স এবং প্রিন্ট মিডিয়ার এক বৃহৎ অংশের পক্ষ থেকে। কিন্তু মানুষ তার অভিজ্ঞতায় দেখছেন লোকসভা বা বিধানসভায় এ রাজ্য থেকে শূন্য হলেও মেহনতীর রুটি-রুজির লড়াইতে একমাত্র পাশে রয়েছেন লালঝাণ্ডা কাঁধে বামপন্থীরাই। এরাজ্যের বামপন্থী দলসমূহের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট মানুষের মধ্যে দারুন সাড়া ফেলেছে। রাজ্যের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক অতীত ঐতিহ্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনতে প্রতিদিন মানুষের ভীড় বাড়ছে লালঝাণ্ডার মিছিলে, সভায়, পথপরিক্রমায়। দেশ ও রাজ্যের মানুষ বুঝে গেছেন সংবিধান, গরিবের অধিকার, সংরক্ষণ কারা কেড়ে নিতে চাইছে আর বিপরীতে ধর্মীয় মেরুকরণের বদলে রুটি-রুটি, সংবিধান-সংরক্ষণ রক্ষাকে ভোটের মূল অ্যাজেন্ডা হিসাবে কারা মনে করছেন, প্রতিদিন তুলে ধরছেন। আমাদের কাজ ভুল অ্যাজেন্ডাকে সরিয়ে মূল অ্যাজেন্ডাকে তুলে ধরা, প্রাসঙ্গিক করা, জয়ী করা। □

দেবাশীষ রায়

রাজ্য প্রসঙ্গে কিছু কথা

রাজ্য প্রসঙ্গে কিছু কথা

রবিঠাকুর বর্জনে নীরব

● কিছুদিন আগে আর এস এস কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথ অপ্রাসঙ্গিক এবং তাঁকে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিতে হবে। অবাক কাণ্ড! কত বড় স্পর্ধা এদের! যাঁকে আমরা প্রতিনিয়ত স্মরণ করি, যাঁর আশ্রয়ে আমরা বাঁচি, যিনি আমাদের জীবনের চলার পথে প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গী, যাঁকে ছাড়া আমাদের অস্তিত্ব কল্পনাবিহীন, সেই কবিগুরুই বাদ! এরপর জাতীয় সংগীতটাকেই না বাদ দিয়ে দেয়! এদেশে ক্রমশ হিটলারের পদধ্বনি সুস্পষ্ট হচ্ছে। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও এবিষয়ে নীরব। তিনি কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না। □

প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতা

● কেন্দ্রের এবং রাজ্যের শাসক দল প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতার এক ভয়ংকর খেলায় নেমেছে। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে, ধর্মীয় বিভাজন, জাতপাতের বিভাজন করে এই দুই শাসক দল মৌলিক সমস্যাগুলি থেকে মানুষের দৃষ্টিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তাদের রুটি-রুজির লড়াইকে পেছন দিকে ঠেলে দিতে চাইছে। এই বিভাজনের রাজনীতি শাসক শ্রেণীর "DIVIDE & RULE" নীতি প্রয়োগ করার হাতিয়ার মাত্র। বিভাজনের রাজনীতিকে রুখে দিয়ে সম্প্রীতির বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়াটাই এখন মেহনতি মানুষের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ। □

রাজ্যকর্মচারীরা ডাকাত

● "ডিএ আন্দোলন যারা করছে তারা সব এক একটা চোর, ডাকাত আর ডাকাতের সর্দার।" —পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য (২৯/০৩/২০২৪)। স্বাধীনতার পর থেকে দেশের কোনো রাজ্যের কোনো প্রধানই তাঁরই সরকারের কর্মচারীদের উদ্দেশ্য করে খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই ধরণের ভাষা ব্যবহার করেননি। এই অসভ্যতা, এই ঔদ্ধত্য সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গেছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরণের আচরণ লজ্জাজনক। এই অপমান কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সরকারি কর্মচারী মেনে নেবেন না। □

বোমা শিল্প

● প্রায়ই শোনা যায়, এই রাজ্যে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে শিশুদের মৃত্যু হচ্ছে, যা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু এর জন্যে দায়ী তো এই রাজ্যের শাসক দল ছাড়া আর কেউ নয়, যারা গোটা রাজ্যটাকে বোমা বানানোর কারখানায় ভর্তি করে দিয়ে তাদের মদতপুষ্ট দুষ্কৃতিদের আঁতুড়ঘরে পরিণত করেছে। এই সরকার বেশিদিন থাকলে আমার আপনার বাড়ির শিশুরাও এই ধরনের ঘটনার শিকার হতে পারে। □

নারীরা আক্রান্ত

● নারী নির্যাতন এ রাজ্যে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। রাজ্যের শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতে দীর্ঘদিন ধরে সন্দেশখালিতে নারীদের ওপর নারকীয় অত্যাচার ও সীমাহীন নিপীড়ন চলেছিল। প্রাণের ভয়ে তাঁরা এ ব্যাপারে এতদিন মুখ খোলেননি। শেষ পর্যন্ত সহ্যের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যাওয়ায় তাঁরা প্রতিবাদ করেছেন এবং গোটা দেশের কাছে রাজ্য সরকারের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। ২০১১ সালে এই শাসক দল রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে কামদুনি, পার্ক স্ট্রীট কাণ্ডের মতো ঘটনা এ রাজ্যে বহু ঘটেছে এবং ঘটে চলেছে। □

দুর্নীতি

● আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে এক দুর্নীতির সরকার চলছে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থান প্রতিটি ক্ষেত্রেই আজ দুর্নীতির চক্রে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির দায়ে চাকরিহারা আজ হাজার হাজার যুবক-যুবতী। রেশন দুর্নীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি, ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতি, কয়লা ও গোরু পাচার, বেআইনি নির্মাণ, সিন্ডিকেটরাজ—গোটা দেশে এর নজির নেই। দুর্নীতির দায়ে শিক্ষামন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী সহ শাসকদলের বহু নেতা-নেত্রীরা আজ জেলে। □

আক্রান্ত অর্জিত অধিকার

● পশ্চিমবঙ্গে সরকারি কর্মচারী সহ সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের অধিকার আজ আক্রান্ত। রাজ্যের শাসক দল এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশকেই নষ্ট করে দিয়েছে। ২০১১ সালে বর্তমান শাসক দল এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিভিন্ন জেলায় সরকারি কর্মচারীদের ওপর হামলা চালানো হয়েছে, তাঁদের সংগঠনের দপ্তর ভাঙচুর করা হয়েছে এবং দু-জায়গায় সংগঠন দপ্তর ভেঙে গুঁড়িয়েও দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলের বহু কার্যালয়ও দখল করে নেওয়া হয়েছে। সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষকদের তাঁদের প্রাপ্য মহার্ঘ ভাতা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট করার অধিকার থাকলেও ধর্মঘট করলে ডায়াস নন করা হচ্ছে ও মাইনে কাটা হচ্ছে। মিছিল, মিটিং করার অধিকারকেও কেড়ে নিতে চাইছে রাজ্য প্রশাসন। আদালতে গিয়ে সেই অধিকার বজায় রাখতে হচ্ছে কর্মচারী সংগঠনগুলিকে। বহু ক্ষেত্রে প্রতিহিংসামূলক বদলির শিকার হচ্ছেন কর্মচারীরা। □

অধিকার প্রয়োগের পূর্বে যা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন

গণবণ্টন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ

● গনবণ্টন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার পরিবর্তে ধাপে ধাপে দুর্বল করা হয়েছে। অন্ত্যোদয় কার্ডের সংখ্যা কমেছে। আধার কার্ডের সাথে রেশন কার্ড লিঙ্ক করার পরিণামে ২০১৩ থেকে ২০২১-এর মধ্যে ৪ কোটি রেশন কার্ড বাতিল হয়েছে।

● কোভিড অতিমারির সময় ৮০ কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাদ্যশষ্য দেবার নামে গণবণ্টন ব্যবস্থায় চালু থাকা ভর্তুকি যুক্ত ৫ কেজি খাদ্যশস্য বিতরণের ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে। বিরোধী দল শাসিত রাজ্যগুলিতে পর্যাপ্ত খাদ্যশষ্য দেওয়া হচ্ছে না।

● আই সি ডি এস ও মিড ডে মিল প্রকল্পকে সম্মিলিত করে পি এম পোষণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে এবং বরাদ্দ ৪০ শতাংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অপুষ্টি বেড়েছে। ২০১৬-২০২০ ০-৫ বছরের শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি বৃদ্ধির হার দেশের অন্তত ৩৪১টি জেলায় বেড়েছে। ২০১৬-২০২১, ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারীদের মধ্যে রক্তাল্পতার হার বেড়েছে ৪.১ শতাংশ।

আক্রান্ত নারী সমাজ

● স্বাধীনতার পর থেকে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের হার এই মুহূর্তে সবচেয়ে কম। এন এস এস ও রিপোর্ট বলছে ২০১৭-১৮-তে ৪০ লক্ষ মহিলা চাকুরিচ্যুত হয়েছে।

● রেগাতে কর্মরতদের অর্ধেকের বেশি মহিলা। ২০১৩-তে পরিবারপিছু বছরে গড় কাজের দিন ছিল ৬০। ২০১৪-২০২১ এই হার ৪০ দিনের নিচে নেমেছে। ২০২২-২০২৩, এটা ৩৩ দিনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

● মহিলা সংরক্ষণ বিল-এর নাম বদলে 'নারী শক্তি বন্ধন অধিনিয়ম' নামে সংসদে সেপ্টেম্বর, ২০২৩-এ পাশ হয়েছে। এই বিলকে জনগণনার সাথে যুক্ত করার নামে কার্যকরী করতে ইচ্ছাকৃত বিলম্ব করানো হচ্ছে।

● হাথরাস, উন্নাও, মণিপুর দেখিয়েছে নারীর সম্ভ্রম এই দেশে আর নিরাপদ নয়। 'লাভ-জিহাদ'-এর নামে নারীদের নিজের পছন্দের সঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার আক্রান্ত। নারীদের উপর আক্রমণের রেখাচিত্র ২০১৪-র পর থেকে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। এন সি আর বি-র তথ্য বলছে ২০১৪-তে নারীদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটছে প্রতি ঘণ্টায় গড়ে ৩৭টি। ২০২১-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯ হয়েছে।

● ২০২১-এ ধর্ষণের ঘটনার হার দিনে ৯০টা। তপশিলি জাতি, উপজাতি মহিলাদের উপর ধর্ষণের হার ২০১৪-র তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

● বিজেপিশাসিত উত্তর প্রদেশ নারীদের উপর আক্রমণের ঘটনায় টানা ছয় বছর শীর্ষ স্থানে (২০১৭-২০২২)। এন সি আর বি রিপোর্ট বলছে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ২০১৭ থেকে ৯৪.৪৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রেও শীর্ষস্থানে বিজেপির মডেল রাজ্য উত্তরপ্রদেশ।

● হিন্দুত্ববাদীরা নারী সমাজকে মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখে। অলিম্পিকে দেশের মেডেলজয়ী মহিলা কুস্তিগীররা বিজেপি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিং-এর বিরুদ্ধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ তুললেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। একই ঘটনা হরিয়ানার মন্ত্রী সন্দীপ সিং-এর ক্ষেত্রেও ঘটে। খুনী এবং বিলকিস বানোকে ধর্ষণকারীদের গুজরাট সরকারের কারামুক্তি দেওয়ার ঘটনাও এর নির্লজ্জ প্রমাণ। □

স্টাডি টিম

সমিতি সম্মেলন

সমিতি সম্মেলন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত সমিতি **ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের** ৪৯-৫০তম রাজ্য সম্মেলন গত ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি '২৪ উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতে বিদ্যাসাগর হলে কমরেড অলকা পাল মঞ্চে ও কমরেড সমীর ভট্টাচার্য নগরে অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৪.৩০ মিনিটে করুণাময়ী আবাসন থেকে একটি সুদৃশ্য মিছিল বারাসতের কিছু অংশ পরিক্রমান্তে বিদ্যাসাগর হলে প্রবেশ করে। অতঃপর বিদ্যাসাগর হলে কমরেড পার্থ গোস্বামী ও কমরেড পার্থ সরকার নামাঙ্কিত বুক স্টল উদ্বোধন করেন জেলার বর্ষীয়ান নেতৃত্ব প্রতাপ মুখার্জী এবং তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে বই কেনা ও পড়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এই বুক স্টল থেকে প্রায় ৪৫ হাজার টাকার বেশি বই প্রতিনিধিরা কিনেছেন।

২৪ তারিখ শনিবার রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে সম্মেলনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়। সম্মেলন কক্ষে প্রবেশের পর জেলার সাংস্কৃতিক শাখা সঙ্গীত পরিবেশন করে। সাধারণ সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত, দূর্গা রায়, সীমা সাহা ও মিঠু সিংহ রায়কে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী ও পাশাপাশি মাইন্যুটস কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন উদ্বোধক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। পরবর্তীতে সম্মেলনের মূল পর্বে প্রতিবেদন উত্থাপন করেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদিকা পিকু ব্রহ্ম। সম্মেলনে দাবি প্রস্তাব সহ মোট নয়টি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন কাজল গিরি, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, সমর্থনে বক্তব্য রাখেন শক্তিময়ী হাজরা, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। বিগত দুই বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ কণিকা দত্ত। ২৫ তারিখ রবিবার সকাল ১০টায় সমিতির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখার সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে পুনরায় সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। প্রতিবেদনের উপর মোট ২৫ জন প্রতিনিধির আলোচনা শেষে জবাবী বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত। সম্মেলন মঞ্চে ছয়জন অবসরপ্রাপ্ত নেতৃত্বকে স্মারক ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও সম্মেলন মঞ্চে প্রতিবারের ন্যায় সমিতির মুখপত্র সেবাব্রতীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সম্মেলনে ২৭৫ জন প্রতিনিধি সহ, ভ্রাতৃপ্রতীম, স্বেচ্ছাসেবক সহ মোট ৩২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বক্তব্য রাখেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি সঞ্জীব বোস, সম্পাদিকা তাপসী ঘোষ।

সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নিবেদিতা দাশগুপ্ত, সম্পাদিকা পিকু ব্রহ্ম, কোষাধ্যক্ষ রেখা চক্রবর্তীকে নির্বাচিত করে ৩০ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ১৫০ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়।

সভাপতির সমাপ্তি বক্তব্য ও আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে ৪৯-৫০তম রাজ্য সম্মেলন সাফল্যের সাথে শেষ হয়। □

আক্রান্ত সংবিধান ও দেশের গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক বৃহত্তর হাতিয়ার গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শেষ হল **ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের** ২৯তম (দ্বি-বার্ষিক) রাজ্য সম্মেলন। সরকারী কর্মচারীদের প্রতি উত্তরোত্তর আক্রমণ, হয়রানিমূলক বদলী ও বঞ্চনার বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলকে ভাঙার চক্রান্তকে রুখেই তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নেওয়া হয় ২৯তম রাজ্য সম্মেলনের মঞ্চে।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে ২-৩ মার্চ, ২০২৪ ২৯তম রাজ্য সম্মেলন কমরেড প্রশান্ত সাহা মঞ্চ, কমরেড সমীর ভট্টাচার্য নগরে অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে প্রগতিশীল পুস্তক বিপনন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক প্রশান্ত চন্দ, দপ্তর সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। ৯, ৭২০ টাকার বই উপস্থিত প্রতিনিধিরা ক্রয় করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য দপ্তর সম্পাদক প্রশান্ত চন্দ। কর্মচারীদের হৃত অধিকার পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে আগামী ১০ মার্চ, ২০২৪ অধিকার যাত্রা সমাপ্তি দিনে কলকাতা যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ডে জমায়েত এবং ১৪ মার্চ 'নবান্ন' অভিযান সফল করার আহ্বান জানান।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ জানা। এরপর আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং দশটি বিভিন্ন প্রস্তাব সম্মেলনে পেশ হয়। আয়-ব্যয়ের হিসেব পেশ করেন শিবু ঘোষ এবং প্রস্তাব পেশ করেন সুভাষ মিত্র। সমর্থন করেন প্রবীর ব্যানার্জী।

সম্মেলনের স্বাগত ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি তথা ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ। অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেন অভ্যর্থনা কমিটির কার্যকরী সভাপতি দেবশঙ্কর সিন্‌হা এবং অভর্থনা কমিটির সম্পাদক সন্তোষ পাল। প্রতিবেদনের উপর ১৩ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। আগামী কার্যকালের জন্য সম্মেলন থেকে সভাপতি নরোত্তম চ্যাটার্জী। সাধারণ সম্পাদক সমীর ব্যানার্জী, কোষাধ্যক্ষ সন্তোষ পাল, দপ্তর সম্পাদক শান্তিমণ্ডল নির্বাচিত হন।

সম্মেলন পরিচালনা করেন নরোত্তম চ্যাটার্জী, অজয় সিং, বাবলু পাল, শশাঙ্ক শেখর সাঁতরাকে নিয়ে সভাপতিমণ্ডলী। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। □

পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতির ৪৯তম দ্বি-বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন গত ২-৩ মার্চ, ২০২৪ বাঁকুড়া জেলায় কমরেড রত্নেশ্বর চট্টোপাধ্যায় নগর, কমরেড রেখা রায় ও কমরেড দীপক মুন্সী মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগের দিন অর্থাৎ ১ মার্চ '২০২৪ কমরেড অশোক পাত্র প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়, উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের প্রবীণ নেতা প্রবীর মুখার্জী। এইদিনই খুবই সুন্দর সময়োপযোগী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ২ মার্চ '২৪ সু-সজ্জিত মিছিল দিয়ে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়। এরপর রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সমিতির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ প্রাক্তন নেতৃত্ব ও স্থানীয় নেতৃত্ব। গণসঙ্গীতের মাধ্যমে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ২০৫ জন প্রতিনিধি, ৭০ জন পুরুষ ও ৩৫ জন মহিলা। সম্মেলন উদ্বোধন করেন মানস কুমার বড়ুয়া, সম্পাদক সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকা ও কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক স্বপন মুখোপাধ্যায় স্বাগত ভাষণ দেন। ১২ই জুলাই কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক প্রণব মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কল্লোল ভট্টাচার্য। একজন দুঃস্থ মেধাবী ছাত্রকে সম্বর্ধনা ও দুই বছরের তার পড়াশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সংগঠন। সংভরণের বিশেষ সংখ্যা উদ্বোধন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। সমিতির সংবিধান সংশোধনের (সদস্য পদ বৃদ্ধি) প্রস্তাব পেশ ও সমর্থন গ্রহণ করা হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিদের আলোচনার জবাবী ভাষণ দেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক অশোক প্রামানিক। কমরেড অরবিন্দ ঘোষের জন্মশতবর্ষের প্রস্তাব পেশ, গ্রহণ ও তার সমর্থনে বক্তব্য রাখেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্মরজিৎ রায়চৌধুরী। এরপর উৎসর্গ মিত্রকে সভাপতি, প্রদীপ কুমার ঘোষকে সাধারণ সম্পাদক ও পিনাকী গোলাদারকে কোষাধ্যক্ষ করে মোট ২৪ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী ও ৭৭ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। □

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
51st Year, 11th & 12th Edition, March-April, 2024
Regd. No. : 18484/71

অধিকার প্রয়োগের পূর্বে যা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন

ধর্মনিরপেক্ষতার বিপরীতে হাঁটা

● ২২/১/২৪—দেশের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রামমন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। রাষ্ট্র ও ধর্ম মিলিয়ে দেওয়া হল।
সংসদে প্রস্তাবে এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা হল—'জাতীয় সচেতনতার প্রতীক' এবং দেশের অগ্রগতির পথে যাওয়ায় এক স্মরণীয় মুহূর্ত" হিসাবে।

● আর এস এস এবং হিন্দুত্ব বাহিনীর পরবর্তী লক্ষ্য কাশীর জ্ঞানব্যাপী মসজিদ এবং মথুরার ইদগাহ মসজিদকে মন্দিরে পরিণত করা। এসব করা হচ্ছে Places of worship (Special Provissions) Act. 1991 কে লঙ্ঘন করে।

সংখ্যালঘু বিরোধী নানা আইন প্রবর্তন

● গো-রক্ষা বিরোধী আইন চালু—উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকে। বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণ বিরোধী আইন, যেমন—লাভ-জিহাদ বিরোধী আইন চালু—উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, গুজরাট, হরিয়ানা, ছত্তিশগড়, হিমাচলপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, কর্ণাটকে। উত্তরাখন্ডে Uniform Civil Code চালু।

● মুসলিমদের ২য় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে দেখা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশ—বুলডোজার চালিয়ে মুসলিম বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। হরিয়ানা সরকার ন্যূহ-এ সংখ্যালঘুদের ১২০৮টি বাড়ি ভেঙেছে।

● মিথ্যা অভিযোগে গণপ্রহার—২০১৫, উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে এভাবেই মহম্মদ আখলাখকে খুন করা হয়।
তথ্য বলছে ২০১৯-এ গণপ্রহারের ঘটনা—১০৭টি

● ঘৃণা সৃষ্টির ভাষণ—NCRB বলছে ২০২১-২২-এ ৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি।

● রামনবমীকে সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টিতে ব্যবহার।

● খ্রীষ্টানরাও আক্রান্ত—United Christian Forum (UCF) বলছে চার্চ, যাজক ধর্মসভার উপর আক্রমণ ঘটেছে ২০২৩-এ—৭২০টি, ২০২৪-এ—১৪৭টি, ২০২২-এ—৫০৯, ২০২১-এ—৫০৩টি। □

শিক্ষাক্ষেত্রে অন্ধকার

● মোদি সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে বরাদ্দ জিডিপি-র ০.৫০ শতাংশেরও কম। ২০১৮-তে ব্যয় ছিল ০.৪৬ শতাংশ, ২০২৩-এ কমে হয়েছে ০.৩৭ শতাংশ। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয়।

● সংখ্যালঘু, দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া অংশের মেয়েদের স্কলারশিপ দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে।

● পাঠ্যবই গুলিতে ইতিহাস, বিজ্ঞানকে সরিয়ে পুরাণকে স্থান দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে মনুবাদী ধারায় পাঠ্যবই সাজানো হচ্ছে। সেখানে মাদ্রাসাগুলি আক্রান্ত।

● নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির মাধ্যমে শিক্ষার বাণিজ্যীকীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণকে একটা কাঠামোগত চরিত্র দেওয়া হয়েছে। কয়েক হাজার স্কুলকে সংযুক্তিকরণ ঘটানো হয়েছে এই নীতি রূপায়ণের জন্য। দুই লক্ষ সরকারী স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও সাম্প্রতিককালে প্রায় আট হাজার স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রের নয়া শিক্ষানীতিকে হুবহু অনুসরণ করছে। □

প্রধানমন্ত্রীর কৃষক বীমা যোজনা (PMFBY)—২০১৬

সাল	মোট এলাকা অন্তর্ভুক্ত
২০১৬-১৭	৫৭০.৮ লক্ষ হেক্টার
২০২২-২৩	৪৮৭.৪ লক্ষ হেক্টার
সাল	**দাবি (Claim) পূরণে ব্যয়**
২০১৮	২৯,৩৩৭ কোটি টাকা
২০২২	১৮,০৪৩ কোটি টাকা

কেন্দ্রের এই উদাসীনতাকে কাজে লাগিয়ে ২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১ বেসরকারি বিমা কোম্পানীগুলি মুনাফা করেছে—২৪৩৫০ কোটি টাকা। কৃষকদের বীমার দাবি না মেটার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

রেগা ঃ ● বরাদ্দ ক্রমশ কমছে—২০১৩-১৪-তে বরাদ্দ মোট বাজেটের ১.৯৮ শতাংশ। ২০২৩-২৪-এ বরাদ্দ মোট বাজেটের ১.৩৩ শতাংশ।

● ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে এই খাতে মোট ব্যয় ৮৮, ৩০৯.৭২ কোটি টাকা। অথচ অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট বরাদ্দ ৮৬ হাজার কোটি টাকা। কার্যত বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে।

● গড় কাজের দিন ৫০ পেরোয়নি। গত বছরে ছিল ৪৭।

● ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৮-১৯ কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে মজুরী ৩ শতাংশ হ্রাস। □

প্রতারিত অন্নদাতারা

এম এস পি ঃ

● মোদি সরকারের প্রতিশ্রুতি ঃ কৃষকদের আয় দ্বিগুন করা হবে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। খাদ্যশস্যের এম এস পি বৃদ্ধি করা হবে।

প্রতারণা ঃ

● কেন্দ্রীয় সরকারের সিচুয়েশন অ্যাসেসমেন্ট সার্ভেস ২০১১-১২ এবং ২০১৮-১৯ বলছে গ্রামীন পরিবারের কৃষিকাজ করে মাসিক আয় হ্রাস পেয়েছে ২৮৫৫ টাকা থেকে ২৮১৬ টাকা (১.৪ শতাংশ)

● স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এম এস পি নির্ধারিত হবে C_2 ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বেশি। ২০১৪ সালে নির্বাচনের আগে মোদি সরকারের প্রতিশ্রুতি তাই ছিল। কিন্তু প্রথমবার নির্বাচনে জেতার এক বছরের কম সময়ের মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১৫-তে মোদি সরকার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে বলে যে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা সম্ভব নয়, কারণ এর দ্বারা বাজারের ভারসাম্য নষ্ট হবে। কেন্দ্রীয় সরকার সহায়ক মূল্য নির্ধারণ করেছে (A_2+FL) অনেক ন্যায্য খরচকে বাদ দিয়ে, যেগুলি স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশে ধার্য ছিল। এই ভুল পদ্ধতির জন্য কৃষকরা প্রতি কুইন্টাল খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ৫০০-৬০০ টাকা কম পাচ্ছে।

● আগের তুলনায় এম এস পি বৃদ্ধির হার নরেন্দ্র মোদির সময় অনেক মন্থর। মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার আগে ২০০৩-০৪ এবং ২০১২-১৩-র মধ্যে প্রধান খাদ্যশস্যগুলির এম এস পি বৃদ্ধির হার ছিল ৮-৯ শতাংশ প্রতি বছরে। মোদি আসার পর ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ এই বৃদ্ধির হার হয়েছে মাত্র ৫ শতাংশ প্রতি বছরে।

● ২০২৩-২৪-এ ধানের এম এস পি নির্ধারিত হারে ২১৮৩ টাকা প্রতি কুইন্ট্যাল। কেরালার বাম ও গণতান্ত্রিক সরকার সেখানকার ধান চাষীদের প্রতি কুইন্টালে বোনাস যুক্ত করে মূল্য ধার্য করেছে ২৮২০ টাকা। □

মূল্যবৃদ্ধি

● আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম অনুসারে আমাদের দেশে ডিজেলের দাম হওয়ার কথা ৪০-৪৫ টাকা প্রতি লিটার। সেখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নানা ধরনের শুল্কের কারণে ডিজেলের দাম এখন ৯০.৭৬ টাকা প্রতি লিটার, পেট্রোল ১০৩.৯৪ টাকা।

● মোদি সরকারের আমলে পেট্রোপণ্যের ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ডিসেম্বর ২০১৪, পেট্রোল—৭২.২৬ টাকা / লিটার, ডিজেল—৫৫.৪৮ টাকা/ লিটার।
মে, ২০২৪, পেট্রোল-১০৩.৯৪ টাকা/লিটার, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা/লিটার।

● ২০১৯ থেকে ২০২৩ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির হার ভয়ঙ্কর। চাল—৩৮.৯৩ শতাংশ, আটা—৩৩.১৬, মুসুর ডাল—৭১.১৬, সর্ষের তেল—৩৪.৩৭, পেঁয়াজ—৪২.৯৩, টমেটো—৭৯.৬১, নুন—৩৭.৩৩ শতাংশ।

● পেট্রোলে এক্সাইস ডিউটি ২৫০ শতাংশ বৃদ্ধি, ডিজেলে ৮২৫ শতাংশ।

● Essential Commodities Act.-কে লঘু করা হয়েছে ফলে PDS দুর্বল হয়েছে।

● উজ্জ্বলা রান্নার গ্যাস—একটা বড় প্রতারণা। একটি সিলিন্ডার বিনামূল্যে। বাকিগুলি বাজারের দামে কিনতে হবে।

● রান্নার গ্যাস—ভরতুকি প্রায় শূন্য হয়ে গেছে।
২০২৪-তে প্রতি সিলিন্ডারের মূল্য ছিল ৪১৪ টাকা। ২০২২-এ প্রায় তিনগুণ ১২১০ টাকা, ২০২৩-এ বিধানসভা নির্বাচনের আগে ২০০ টাকা কম করা হয়।

● বিশ্ব ক্ষুধাসূচক—২০২৩-এ ১২৫টা দেশের মধ্যে ১১১তম। ২০১৪-তে ছিল ৬৩ তম। □

বেকারী বৃদ্ধি

● ১৯৮৩-২০০৩ ভারতে বেকারির গড় হার ছিল—৭ শতাংশ
২০১৪ সালে বেকারির হার—৫.৪৪ শতাংশ
২০২৩ সালে বেকারির হার—৮.০৩ শতাংশ

● বেকারীর হার বর্তমানে বিগত চার দশকের সর্বোচ্চ। □

শ্রমজীবীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা

● চালু থাকা ২৯টি শ্রম আইনকে ৪টি শ্রমকোডে রূপান্তর করে শ্রমিকদের স্বীকৃত অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, অপরদিকে মালিকদের আরও ক্ষমতাশালী করা হয়েছে।

● শ্রমকোডগুলি সংসদে পাশ করার সময় বলা হল এর মধ্য দিয়ে ন্যূনতম মজুরি সর্বজনীন হবে। বাস্তবে মজুরী কোডে এর উল্টো বিষয় থাকল। ন্যূনতম মজুরির বিষয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমা নির্ধারিত হল। অসংগঠিত ক্ষেত্র সহ সব ক্ষেত্রের শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করল না। ১৫তম আই এল সি (ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স) ন্যূনতম মজুরীর যে ফরমুলা সুপারিশ করেছিল তা নিয়মে উল্লিখিত থাকলেও বাস্তবে কার্যকর করা হল না।

● পেশাগত নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের পরিবেশ সংক্রান্ত কোডে শ্রমিকদের স্বার্থ না রক্ষিত হয়ে মালিকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে। দিনে ১২ ঘণ্টা কাজ করার নিদান এই কোডে আছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য পূর্বতন আন্তরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক আইনে কিছু সুরাহা ছিল। নতুন শ্রমকোডে সেগুলি হয় বাতিল, নয়তো লঘু করা হয়েছে।

● শিল্প সম্পর্ক সম্পর্কিত কোডে শ্রমিকদের যৌথ আন্দোলন করার অধিকার কার্যত কেড়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অত্যন্ত কঠিন করা হয়েছে। রেজিস্ট্রারদের হাতে ইউনিয়ন বাতিল করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মালিক কর্তৃপক্ষকে কার্যত যে কোনো ধর্মঘটকে বেআইনী ঘোষণা করার অধিকার দিয়েছে এই কোড।

● সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কোডে শ্রমিকদের কোনো নির্দিষ্ট সুবিধার প্রস্তাব নেই, কোনও সুনির্দিষ্ট প্রকল্পও নেই। এমনকি চালু সামাজিক নিরাপত্তামূলক প্রকল্পগুলিকে অনিশ্চিত করা হয়েছে। ইপিএফ, ইএসআই-কে বাতিল করার প্রক্রিয়া নেওয়া হয়েছে।

● মোদি সরকারের এই শ্রমকোড আনার আসল উদ্দেশ্য বড় কর্পোরেটদের ব্যবসা করার ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণ।

● কেন্দ্রীয়সরকারীকর্মচারীদেরনয়াপেনশনস্কীমবাতিলকরেপুরাতন পেনশন ব্যবস্থায় যাবার সম্ভাবনাকে প্রত্যাখান করেছে মোদি সরকার।

● অঙ্গনওয়াড়ি ও সহায়কদের ভাতা ২০১৮ থেকে ১ টাকাও বৃদ্ধি হয়নি। মোদির জমানায় বিগত ১০ বছরে আশা কর্মী ও মিডডে মিল কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি হয়নি।

● কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রবন্ধে কর্মরত প্রায় ৮০ লক্ষ শ্রমিক, যার মধ্যে প্রচুর মহিলা আছেন, তাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে না। আই এল সি-র সুপারিশ সত্ত্বেও তা করা হচ্ছে না এবং এরা (আশা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ইত্যাদি) ন্যূনতম মজুরি সহ অন্যান্য অধিকার থেকে বঞ্চিত।

● চুক্তির কর্মচারী বৃদ্ধি পাচ্ছে, স্থায়ী শ্রমিক কর্মচারী হ্রাস পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থাগুলিতে ২০১৩ থেকে ২০২২ পর্যন্ত ২.৭ লক্ষ স্থায়ী কর্মীর বিলোপ ঘটেছে। অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ঐ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে ১৯ শতাংশ থেকে ৪২.৫ শতাংশ। মোদি সরকারের দশ বছরে চুক্তির কর্মচারীর ৬৫ শতাংশ নিযুক্ত হয়েছে, বি এস এন এল, এম টি এন এল, স্টিল অথরিটি অব ইন্ডিয়া লিমিটেড সহ ৭টি রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থায় বিগত ১০ বছরে ২০ হাজারেরও বেশি কর্মচারী হ্রাস পেয়েছে। রেলে ৩ লক্ষের বেশি পদ খালি, তাও নিয়োগ হচ্ছে না। □

স্টডি টীম

সুরক্ষিত থাক—সংবিধান বর্ণিত দেশের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক-প্রজাতন্ত্র, সার্বভৌমত্ব, সব অংশের জন্য সামাজিক ন্যায় এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।